বাংলা পাঠন-পদ্ধতি

সুখময় সেনগুপ্ত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম্ চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ন, ১৩৬৭

মুদ্রাকর ঃ
দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
সিমলা স্ট্রীট্

ভূমিকা

'বাংলাদেশে বাংলা পড়ানো' নামে আমার মাতৃভাষা পাঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি পুস্তক কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে বাংলা পাঠন সম্পর্কে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সৌভাগ্য হয়েছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে চিন্তা ও আলোচনার সুযোগ হয়েছে। ফলে মাতৃভাষা পাঠন সম্পর্কে অনেক কথা জমা হয়ে উঠেছিল যা আগের বইটিতে বলা হয়নি। পূর্বের প্রবন্ধগুলির সঙ্গে সেই সব কথার সন্নিবেশ করে 'বাংলা পাঠন-পদ্ধতি' রচিত হ'ল।

বাংলা পাঠন সম্পর্কে আমার অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা ও চিন্তা মিশিয়ে কিছু লিখবার প্রথম নির্দেশ পাই বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ প্রবোধরাম চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে। তারপর এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন এবং নানাভাবে সহায়তা করেছেন ক্যালকাটা গার্লস্ বি টি. কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী লতিকা গুপ্ত, হুগলী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বসু, বহরমপুর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী কলিকা কিস্কু এবং বাংলা ভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিকক্ষ বন্ধুবর শ্রীশক্তিকুমার সরকার। এঁদের সহায়তা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। লেখার সময় আমাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে শ্রীমতী অপর্ণা সেনগুপ্ত এবং শ্রীমান্ নিশীথ সেন। এঁদের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানানোর সম্পর্ক আমার নয়।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে মুখ্যতঃ কলকাতা, বিশ্বভারতী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসরণ করলেও পুস্তকটিতে মাতৃভাষা বাংলা পড়ানো সম্পর্কে আমি প্রয়োজনীয় সকল বিষয় আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। বইটি যদি বাংলাদেশের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আগ্রহশীল অভিভাবক-অভিভাবিকাদের কাজে লাগে, তবেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

সুখময় সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব

মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে তার অপরিচিত এই জগতে এসে উপস্থিত হয়। এই অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তার পরিচয় ঘটে এই পরিবেশ পরিচিতির ব্যাপারে মাতৃভাষা অপরিসীম সাহায্য করে।

মানুষ সামাজিক জীব। এই সমাজ তার জীবনকে, তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে। সমাজকে বুঝতে হলে, সমাজের সাথে যুক্ত হ'তে হলে সমাজের ভাষায় পটুতা প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ। এই আত্মপ্রকাশ অন্নবস্ত্রের চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়। যে বাঙালী নিজের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে পারল না, সে যে শুধু বাঙালী হল না তা নয়, সে পুরাপুরি মানুষও হতে পারল না। শিশুর সমস্ত সত্তা, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে রূপ নেয়। এই মাতৃভাষার শিক্ষায় যদি যত্নবান না হওয়া যায়, তবে শিশুর ভিতরের মানুষটিকে বিকৃত করে দেওয়া হয়।

শিশুর সার্থক আত্মবিকাশের ব্যাপারেও মাতৃভাষাই সবচেয়ে বেশী উপযোগী। বুদ্ধির বিকাশ, জ্ঞানের বিকাশ চিন্তা ও অনুভূতির বিকাশ—মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই সার্থকভাবে সম্পন্ন হতে পারে। বিগতকালের মানুষের অভিজ্ঞতা আমরা শিক্ষার মাধ্যমেই আয়ত্ত করি। আবার, আমাদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রেখে যাই অনাগত দিনের মানুষের জন্য। এই পূর্বগামীদের অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করার ব্যাপারে মাতৃভাষাই সবচেয়ে বেশী উপযোগী। এজন্য সবদেশে মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম।

সুসাহিত্যিক আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ দিক পুষ্ট করে তোলেন। এই অনুভূতির দীক্ষা (emotional training) মাতৃভাষায় লেখা সাহিত্য পাঠে যেমনটি হয়, অন্যভাষার সাহিত্য পাঠে তেমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। আবার মাতৃভাষাতেই নানা লেখা লিখে আমরা আমাদের আদিম আবেগের উদ্গতি সাধন করতে পারি। তাই মাতৃভাষায় অধিকার না জন্মালে মন, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির সুষ্ঠু গঠন ও বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ব্যক্তি-জীবনে ভাষার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। আমরা মনে করি ভাষা আমাদের চিন্তার বাহন। কিন্তু এটা আংশিক সত্য। ভাষাই হচ্ছে চিন্তা এবং এই ভাষা মাতৃভাষা। মাতৃভাষার উপর অধিকার না থাকলে চিন্তাশক্তি দুর্বল ও রুগ্ন হতে বাধ্য। Mr. Samson তাঁর "English for the English" গ্রন্থে ইংরেজের পক্ষে ইংরেজীভাষা কি জিনিস তা বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর কথাগুলো অনুসরণ করে বাংলা ভাষা বাঙালীর পক্ষে কি বস্তু তা বোঝা যাবে।—"For an English boy, English is a condition of existence, rather than a subject of instruction. It is an inescapable circumstance of life and concerns every Englishman from the cradle to the grave. It is part of child's initiation into the life of man." বাঙালী কবি অতুলপ্রসাদও এই একই কথা অনবদ্য-ভাবে বলেছেন—

'এই ভাষাতেই প্রথম বোলে ডাকলাম মায়ে 'মা' 'মা' বলে,
এই ভাষাতেই বলব হরি, সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।'

মাতৃভাষা পরিহার করে কোন ভিন্ন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত হওয়া ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে কত বড় অন্তরায় তা রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন।—"ছোটবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মত হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুসি হইয়া জাগিয়া উঠে,—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়।

"বাঙালীর পক্ষে ইংরাজী শিক্ষায় এটি হইবার যো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে। মুখ বিবরের মধ্যে একটা ছোটখাট ভূমিকম্পের অবতারণা হয়।...প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়।"

বাংলা ভাষার কথা

পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভাষী অসংখ্য জাতির বাস। গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে এক-একটি মৌলিক ভাষা থেকে স্থানকাল ভেদে অনেকগুলি ভাষাব উদ্ভব হয়েছে। পণ্ডিতেরা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিদের ভাষাকে এইবকম একটি মৌলিক ভাষা বলে অনুমান করেন। এই জাতিই প্রাচীন আর্যজাতি। এরা ছিল প্রধানতঃ পশুপালক যাযাবর জাতি। এদের বাসস্থান ছিল ইউরেশিয়ার মধ্যস্থলে। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা আনুমানিক ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই ভাষার নিদর্শন কোন সাহিত্যে নাই। এই ভাষাই স্থানকাল ভেদে পরিবর্তিত হয়েছে এবং নিম্নলিখিত ভাষাগুলির সৃষ্টি হয়েছে—

(ক) টিউটনিক বা জার্মানিক ভাষা—গ্রেটব্রিটেন, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের ভাষা এই ভাষা থেকে উৎপন্ন।

(খ) কেল্‌টিক—ওয়েল্‌স ও আয়র্ল্যাণ্ডের ভাষা এই থেকে জন্মেছে।

(গ) ইতালিক—লাটিন ভাষা এই ভাষা থেকে উদ্ভূত। ফরাসী, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের ভাষা এই ভাষা থেকে উৎপন্ন।

(ঘ) হেল্লেনিক—আধুনিক গ্রীসের ভাষা এই ভাষার বংশধর।

(ঙ) স্লাব—রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষা এর বংশধর।

(চ) আর্মেনীয়—বর্তমান আর্মেনিয়ার ভাষা এর বংশধর।

(ছ) আলবেনীয়—বর্তমান আল্‌বেনিয়ার ভাষা এর বংশধর।

(জ) তুখারীয়—বহুকাল পূর্বে লুপ্ত।

(ঝ) হিট্টী—বহুকাল পূর্বে লুপ্ত।

(ঞ) ইন্দো-ইরানীয়—ইরানে উপনিবেশকারী আর্যদের ভাষা।

আদি ভারতীয় আর্য-ভাষা—খ্রীষ্ট পূর্ব ১৫০০ শতাব্দীর পূর্বেই আর্য-জাতির একটি শাখা ইরান (পারস্য) থেকে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে যে আর্যশাখা এল তারা 'ভারতীয় আর্য' নামে পরিচিত হল। ঋগ্বেদে ভারতীয় আর্যজাতির ভাষার নিদর্শন আমরা পাই। এই 'বৈদিক সংস্কৃত'ই আদি ভারতীয়-আর্য ভাষা।

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ [খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ অব্দ ১০০০]—ভারতে প্রবেশ করে আর্যরা প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ও পশ্চিম পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে। তারপর ধীরে ধীরে তারা ভারতের একটা সুবিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ছড়িয়ে পড়বার ফলে ও দেশের বিভিন্ন অনার্য ভাষার সংস্পর্শে এসে আদি ভারতীয়-আর্য ভাষা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে মধ্যযুগের ভারতীয়-আর্য ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হল। প্রধান প্রধান প্রাকৃতগুলির অঞ্চল ভেদে নাম—মহারাষ্ট্রী, (মহারাষ্ট্রের ভাষা) শৌরসেনী, (শূরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের ভাষা), মাগধী (মগধের ভাষা) ও অর্ধমাগধী (জৈনদের শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা)।

এই সব বিভিন্ন প্রাকৃত আর্যেতর জাতির ভাষার সঙ্গে মিশে আবার পরিবর্তিত হল। এই পরিবর্তিত প্রাকৃতের নাম অপভ্রংশ। অপভ্রংশের সময়টা হচ্ছে আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ অব্দ। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন অপভ্রংশও বিভিন্ন হল। এই অপভ্রংশই কালক্রমে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় পরিণত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাংলাদেশে মাগধী প্রাকৃতের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তারপর প্রায় ছ'সাত শ' বছর ধরে পরিবর্তনের ফলে মাগধী প্রাকৃত মাগধী অপভ্রংশ ভাষার ভেতর দিয়ে একটা নূতন অবস্থায় পৌছানর ফলেই বাংলা ভাষার উদ্ভব। অতএব দেখা যাচ্ছে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে মাগধী অপভ্রংশের রূপ-পরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। এই বাংলা ভাষাকে আমরা যুগের হিসাবে তিনটি ভাগে ভাগ করি। প্রাচীন বাংলা, মধ্যযুগের বাংলা ও আধুনিক বাংলা। আধুনিক বাংলাভাষার চারটি উপভাষা —রাঢ়, বারেন্দ্র, কামরূপ ও বঙ্গ। এই ভাষার রূপ দুটি—সাধু ও চলিত।

কিভাবে প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা (বৈদিক সংস্কৃত) থেকে বর্তমান বাংলাভাষা উৎপন্ন হয়েছে নীচে তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান হল :

	বৈদিক ভাষা	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাঃ বাংলা	বর্তমান বাংলা
১।	সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সঞ্ঝ	সাঁঝ	সাঁজ
২।	ইন্দ্রাগার	ইন্দাআর	ইন্দার	ইন্দারা	ইঁদারা
৩।	গ্রাম	গাম	গাঁব	গাঁও	গাঁ
৪।	কৃষ্ণ	কন্হ	কন্হ	কাহ্ন	কানাই
৫।	ভবতি	হোতি	হোই	হোই	হয়

সংস্কৃত ভাষার অভ্যুত্থান -সংস্কৃত কাব্য-নাটক প্রভৃতিতে আমরা যে সংস্কৃত ভাষার সাধারণতঃ পরিচয় পাই তা প্রাকৃত-যুগে জন্মেছে। এই সংস্কৃত আর্যদের মৌখিক ভাষা নয়, এটা একটা তৈরি (artificial) লেখ্য ভাষা। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ভাষার প্রভাবে যখন বৈদিক ভাষা দ্রুত বিকৃত হতে সুরু করল, তখন একটি বিশুদ্ধ ভাষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি তাঁর সুশৃঙ্খল ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেন। এই ব্যাকরণের সংস্কারের দ্বারা যে লেখ্য ভাষার উদ্ভব হল, তাই হচ্ছে সংস্কৃত (Reformed) ভাষা।

বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব—আর্যদের আসবার আগে বাংলা দেশে প্রধানতঃ দ্রাবিড ও কোলগোষ্ঠীর বাস ছিল। তাই বৈদিক সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হলেও বাংলাভাষায় দ্রাবিড ও কোলভাষার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দ্রাবিড়ীয় ধ্বনি, শব্দসম্ভার, বাক্যগঠন-রীতি বাংলাভাষাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। বাংলায় তালব্য ও মূর্ধন্য ধ্বনির প্রভাব, পূর্ব ও উত্তর বাংলায় ঘোষধ্বনির অঘোষ উচ্চারণ, 'স'-কারের 'হ'-বৎ উচ্চারণ, চ্ ছ্-এর 'স্' উচ্চারণ দ্রাবিড়ীয় ধ্বনির প্রভাব। বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ অনুকার শব্দের বহুল ব্যবহার দ্রাবিড়ীয় প্রভাবের ফল। কারক-বিভক্তি হিসাবে অনুসর্গ বা পরসর্গের ব্যবহারও এই রীতির ফল। বাংলার সংযোগমূলক ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রচুর ব্যবহার এবং 'হয়' ক্রিয়ার লোপ দ্রাবিড়ীয় ভাষার অনুরূপ। তা'ছাড়া নীহার, নানা, বল্লী, বিল, ফল, বীজ, কপি, কলা প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে।

কোলগোষ্ঠীর কোল সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষা বাক্যগঠন রীতিতে প্রভাব বিস্তার না করলেও, শব্দ-সম্পদ দিয়ে বাংলাকে পুষ্ট করেছে। গোঁফ, বাখারী, কুলা, ঢেঁকি, কাঁচা, ডাগর, ডাঁশা প্রভৃতি শব্দ কোলগোষ্ঠীর ভাষা থেকে বাংলা পেয়েছে।

বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব—ফারসী, আরবী, তুর্কী প্রভৃতি শব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে। আজকের বাংলায় আমাদের নিত্যব্যবহার্য বহু শব্দ ফারসী থেকে নেওয়া হয়েছে। যে-সব আরবী ও তুর্কী শব্দ বাংলায় এসেছে, তারা ফারসীর মধ্য দিয়েই বাংলায় এসেছে। তাই তাদেরও ফারসীর অন্তর্ভুক্ত করা হল।

ফারসী শব্দ—শিকার, খাজনা, দারোগা, আসামী, কারখানা, উকীল, মালিক, কবর, কারিগর, বাজার, দোকান, বাগান, ময়দান, কলম, মজবুত, মামলা, আলখাল্লা, উজবক, উদু´, কোর্মা, বোচকা ইত্যাদি ; 'চী' বা 'চি'-প্রত্যয়, যেমন,—তবলচী, খাজাঞ্চি, মশালচী।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পর্তু´গীজদের আগমনের পর থেকে বহু **পোর্তু´গীজ** শব্দ বাংলাভাষায় এসে গেছে—জানালা, তোয়ালে, সাবান, পেঁপে, আনারস, বালতি, বোতাম, বোতল ইত্যাদি।

১৮ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ইংরেজের অধিকারে আসে, ফলে অসংখ্য **ইংরেজী** শব্দ বাংলায় এসেছে ; যেমন—স্কুল, কলেজ, মাষ্টার, ক্লাস, চেয়ার, টেবিল, টিন, ডিস, ডাক্তার, পেনসিল, টিকেট, সিনেমা ইত্যাদি।

অনেক সময় মূল ইংরেজী শব্দকে আমরা বাংলায় একটু বিকৃত করে নিয়েছি ; যেমন—গেলাস, লণ্ঠন, হাসপাতাল, বিস্কুট, স্কুল, সান্ত্রী (Sentry), আস্তাবল (Stable) ইত্যাদি।

ফরাসী শব্দ—কার্তু´জ, কুপন, ডিপো ইত্যাদি।

চীনা শব্দ—চা, চিনি, লুচি, সিন্দূর ইত্যাদি।

অধুনা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাষা থেকেও অনেক শব্দ বাংলাভাষায় আসছে ; যেমন—**হিন্দী** থেকে পুরী, মরদ, কাঁহাতক ; **গুজরাতী** থেকে খদ্দর, হরতাল প্রভৃতি।

কয়েকটি ভিন্ন জাতীয় শব্দ পরস্পর মিশে বাংলাভাষায় বহু নতুন শব্দের সৃষ্টি করেছে। এদের **মিশ্রশব্দ** বলা চলে। যেমন—মাষ্টারমশায়, হেড্-পণ্ডিত, হেডমিস্ত্রি, হাফ্‌হাতা, হাফ্‌ছুটি, **গুরু (তৎসম)-গিরি (ফারসী শব্দ)**।

বাংলাভাষায় শব্দ সংখ্যা প্রায় সোয়া লক্ষ। এদের প্রায় অর্ধেক তৎসম শব্দ। বাংলায় ২৫০০ আরবী-ফারসী শব্দ, ১০০ পর্তু´গীজ, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী শব্দ এবং ৮০০-এর উপর ইংরেজী শব্দ। তৎসম ও বিদেশী শব্দ বাদে বাকী সব শব্দ তদ্ভব ও দেশী।

সাধু বাংলা ও চলিত বাংলা

বাংলা লেখ্যভাষার দুটি রূপ—সাধু ও চলিত। সাধু বাংলা চৈতন্য-পরবর্তী যুগে নবদ্বীপ ও নদীয়া অঞ্চলের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ব্যবহৃত ভাষার উপর ভিত্তি করে তৈরি, আব চলতি বাংলা কলকাতা ও কলকাতার কাছাকাছি ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সাধুবাংলা সারা বাংলা দেশের সম্পত্তি। বহুদিন ধরে এর চর্চা চলছে, তাই এ ভাষায় লেখা সকল বাঙালীর পক্ষেই সহজ। কিন্তু চল্‌তি বাংলা কোলকাতার বাইরের স্বাভাবিক ভাষা নয়। তাই কোলকাতার কাছাকাছি জায়গা ভিন্ন অন্য জায়গার বাঙালীদের পক্ষে এ ভাষা আয়ত্ত করা আয়াসসাধ্য। সাধারণভাবে বলা যায় সাধু বাংলায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ একটু বেশী এবং এতে ক্রিয়া ও সর্বনামের পূর্ণ রূপগুলির ব্যবহার হয়। চলতি বাংলায় তৎসম শব্দের ব্যবহাব স্বল্প এবং এতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অব্যয়ের সংক্ষিপ্ত রূপগুলোর ব্যবহার হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের ভাষাকেই আমরা সাধুবাংলা বলি। অবশ্য একথা ভোলা চলে না যে এঁরাই প্রথম সংস্কৃত-প্রধান সাধুবাংলা থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্ত করে তার একটা সরল রূপ দেবার চেষ্টা করেন। চলতি বাংলাকে প্রথম সাহিত্যে আমদানি করেন টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর 'আলালের ঘবের দুলাল' লিখে। এরপর চেষ্টা করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম পেঁচার নকসা' লিখে।

টেকচাঁদের বই বেরোবার পর বঙ্কিমচন্দ্র উল্লসিত হয়ে বললেন, 'এতদিনে বিষবৃক্ষের মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।' স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও চলতি ভাষার সপক্ষে নানা সারগর্ভ যুক্তি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, "চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈরি করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলায় ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত হয়?" রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, পরশুরাম প্রভৃতি পরবর্তী সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় চল্‌তি ভাষার অদ্ভুত শক্তি ও সম্ভাবনার উৎস উদঘাটিত করলেন। আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধুবাংলা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো সুয়োরাণী, দুয়োরাণী গল্প অবতারণা

করে ইঙ্গিত করে গেলেন যে আসন্ন ভবিষ্যতে একদিন সাধুভাষা বিদায় নেবে এবং চলতি ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

অবশ্য সাধুভাষাও বসে নেই। প্রচুর তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে সাধুভাষা চলতির দিকে এগিয়ে চলেছে আর চলতি ভাষাও প্রয়োজনবোধে গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা করছে না।—ফলে সাধু আর চলতি ভাষার প্রভেদ দাঁড়িয়েছে কেবলমাত্র ক্রিয়া আর সর্বনামের রূপে। যেমন -

	সাধু ভাষা	চলতি ভাষা
	করিয়াছেন	করেছেন
সমাপিকা ক্রিয়ারূপ	গিয়াছেন	গেছেন
	দেখিয়াছি	দেখেছি
	যাইতেছেন	যাচ্ছেন
অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ	দেখিয়া	দেখে
	ভাবিয়া	ভেবে
যৌগিক ক্রিয়া	শুইয়া পড়িলেন	শুয়ে পড়লেন
	বসিয়া থাকিও না	ব'সে থেকো না
	ছুটিয়া আইস	ছুটে এস

সর্বনামের বেলাতেও তাহার, তাহাকে, তাহাদিগকে, তাহাদিগের না লিখে লিখতে হয়—তার, তাকে, তাদিকে, তাদের ইত্যাদি। বাংলা চলিত ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অভিশ্রুতি। যেমন, রাখিয়া—রেখে, থাকিয়া—থেকে ইত্যাদি। স্বরসঙ্গতি ও চলিত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যেমন, দেশি > দিশি, শুনা > শোনা, পূজা > পূজো।

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশী, কিন্তু চলিত ভাষায় তদ্ভব, অর্ধতৎসম এবং দেশী শব্দের ব্যবহার বেশী। বাংলা ভাষায় যে সব 'ইডিয়ম' আছে, সেগুলি সবই চলিত ভাষায়।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ থেকে বেছে কৌতূহলী পাঠকের জন্য কয়েকটি সাধু ও চলিত বাংলায় লেখার নমুনা দেওয়া হল। এথেকে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়ার দিকে উৎকট রকমের সাধু আর উৎকট চলতির রূপ পাওয়া যায়—আর সেই সঙ্গে বোঝা যাবে চলিত বাংলা নানা ভাবে নিজেকে সাজিয়ে কী ভাবে সাধুবাংলাকে আসর থেকে হটিয়ে দিচ্ছে।

'অবগত হওয়া গেল যে বাজারের মহাজনেরা তণ্ডুল মহার্ঘ হওয়াতে কৃত্রিমতা প্রকাশ করিতেছে তণ্ডুলের মহাজনেরা বালামের সহিত সবেদা মিশ্রিত করিয়া আতপ তণ্ডুল কহিয়া তিন টাকা পাঁচ আনা মোণ দরে বিক্রয় করিতেছে। [সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮৪৫]

'মহর্ষি শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটে কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি।

[শকুন্তল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৮৫৪]

'ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রবৃত্তি তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। [কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিম, ১৮৬৬]

'রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকারে বাহির হইতেন। এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না।...বউঠাকুরাণী রাশীকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ-জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই। [—রবীন্দ্রনাথ]

'এতদিন জীবনটাকে সে যে ভাবে পাইয়াছে, সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে —ভাগ্যনির্দিষ্ট সেই পরিচিত খাদের মধ্য দিয়াই ষোড়শীর জীবনের কুড়িটা বছর প্রবাহিত হইয়া গেছে, ইহাকে ভৈরবীর জীবন বলিয়া সে অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে, একটা দিনের তরেও আপনার জীবন বলিয়া ভাবে নাই।

[—শরৎচন্দ্র]

'আজ প্রতিপদ। পূজার আর দিন নাই।...কুমোরটুলীর নগদা সরস্বতীরা বেধড়ক বিক্রি হয়ে মুটের মাথায় উঠচেন। কুমোরেরা শেষকালে আর যোগাতে না পেরে বাড়তি দোমেটে করা জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণের হাতি ও সিঙ্গী ভেঙে, দুখানি হাত কেটে, ঘাড় বেঁকিয়ে সাদা করে স্থান পূর্ণ কচ্চে। রাজপথ যেন সরস্বতীময় বোধ হচ্চে। [—কালীপ্রসন্ন সিংহ]

'বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। ·ছেলেবেলায় যে সব

গান আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়। তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছিল।

[—রবীন্দ্রনাথ]

'দাঁড়িয়ে ছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়। জন দশ বারো লেঠেলে জমায়েত হয়েছিল পূর্বদিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের সুমুখে; পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ীর দাসী চাকরাণীরা কখনো কখনো বাতদুপুরে পেত—ধোয়ার মতো যাঁর ধড়, আর কুয়াসার মতো যাঁর জটা। [—প্রমথ চৌধুরী]

'বাবা বাবু-মানুষ। নতুন বাবু, রূপো-বাঁধানো ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান, কোঁচা বাঁ-হাতে নিয়ে; ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে ঝক্‌মকে আংটি। প্রজাপত্তরের কাছে খুব খাতির। [—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

'তারপর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যে সকল মহীপাল আছেন তাঁরা বলুন আমার বাক্য ধর্মসংগত কিনা ও অর্থকর কিনা। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন। ক্রোধের বশীভূত হবেন না।

[—রাজশেখর বসু]

'চতুর্দিকে হুলস্থূল কাণ্ড; কিন্তু নিঃশব্দে। মেঘে-মেঘে আকাশে আকাশে পাহাড়ে-পর্বতে ঘর-বাড়িতে এমন কি জলে-বাতাসে এই যে বিরাট অগ্নি-কাণ্ডটা হয়ে যাচ্ছে, তাকে নেভাবার জন্য চেঁচামেচি চীৎকার হচ্ছে না, আগুনের তাপে কাঠ বাঁশ ফেটে যাওয়ায় ফট্‌ফট্ দুদ্দাম শব্দ হচ্ছে না, ঐ যে লেকের পাড়ে সোনালী বেঞ্চিতে বসে আছে মেয়েটি, তার সাদা ফ্রকে আগুন লেগেছে, সেও চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ছে না। এ কী কাণ্ড!

[পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী]

আজকাল ছাত্রছাত্রীদের লেখায় সাধু ও চলিত বাংলা হামেশা মিশে যাচ্ছে। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা উভয়ের মধ্যে শব্দ প্রয়োগে অনেক মিল থাকলেও, ভাষা প্রয়োগের রীতিতে দুটিই পৃথক ও নিজ নিজ নিয়ম মেনে চলে। লেখায় এই দুটি ভাষার মিশ্রণ নিয়ম বিরুদ্ধ। এ মিশ্রণের কারণ অনেক :

প্রাথমিক স্তরের পড়ার বই চলিত ভাষায় লেখা। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকে ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে বিভিন্ন যুগের লেখকদের লেখা সংকলন করা হয়। তাতে গদ্যাংশ সুরু হয় ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্য দিয়ে আর শেষ হয় হাল আমলের কোন লেখকের গদ্যের নমুনা দিয়ে। পদ্যাংশ সুরু হয়

কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দিয়ে শেষ হয় কোন আধুনিক কবির কবিতা দিয়ে। কারো ভাষা কড়া সাধু, কারো চরম চলিত। ছাত্রদের সামনে যখন ভাষার এ ধরণের পাঁচ মেশালি আদর্শ ধরা হয় তখন নিজে কিছু লিখতে গিয়ে ছাত্ররা সাধু ও চলিত মিশিয়ে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই যথাসম্ভব সাধুরীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কিন্তু চলিত রীতিতে তারা কথা বলে ও কথা বলতে শোনে। তাই স্বাভাবিক-ভাবে চলিত রীতিই ছাত্রদেব মনে প্রভাব বিস্তার করে। তাই যখন সে সাধু ভাষায় কিছু লিখতে যায়, তখন নিজের অজান্তেই লেখায় চলিত রীতি এসে গিয়ে ভাষার মিশ্রণ ঘটায়।

ছাত্রদের দুটো ভাষা মিশিযে ফেলাব আর একটি কারণ শিক্ষকেরা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেকেই পুরানো আমলের শিক্ষকের কাছে মাতৃভাষার দীক্ষা পেয়েছেন। ফলে তাঁদেব স্বাভাবিক আকর্ষণ অস্বাভাবিক সাধুভাষার উপর। তাই তাঁবা যে ছাত্র চলিত ভাষায লিখছে তাকে উৎসাহিত না করে, বরং তাব দিকে বাঁকা চোখে তাকান। ফলে ছাত্রবা ভেবে বসে সাধুভাষায় প্রশ্নেব উত্তব লিখতে হবে। ছাত্রবা চিন্তা করছে এক ভাষায় আর প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে আব এক ভাষায়—এ অবস্থায় দুটো ভাষা স্বাভাবিক-ভাবেই মিশে যায়।

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা মিশ্রণেব নিবাবণ বা প্রতিকার করতে হলে বাংলা ভাষার শিক্ষককে আবিষ্কার করতে হবে ছাত্রেব স্বাভাবিক আকর্ষণ ভাষার কোন রূপটির দিকে। এটা জানবার পর যাব যেদিকে টান তাকে সেই ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতে শিক্ষা দিতে হবে।

অবশ্য একথা বৈজ্ঞানিক সত্য এবং এটাই স্বাভাবিক যে ছাত্রের স্বাভাবিক টান থাকবে চলিত ভাষার দিকে। শিক্ষার্থীরা যদি যথাসময়ে চলিত ভাষায় লেখা শিক্ষকের সহায়তায় অভ্যাস করে, তাহলে সাধু ও চলিত ভাষায় মিশ্রণের দোষ তাদের লেখায় ঘটতে পারে না।

ভাষারীতি আয়ত্ব হয় লেখার চর্চা দ্বারা, ব্যাকরণ বোধের দ্বারা নয়। তাই চলিত ভাষাতে লিখতে অভ্যাস করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। তবু উঁচু শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়ানোর সময় সাধু ও চলিত ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপগত পার্থক্য, স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতির পরিচ্ছন্ন বোধ ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে।

*

পড়তে শেখানো

শিশু যখন প্রথম পড়তে শেখে তখন তার কাজ বর্ণগুলি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা ; তারপর আসে শব্দ, তারপর বাক্য। শিশুর শব্দভাণ্ডার আর ভাষা-জ্ঞান বাড়তে থাকে।

সরব পাঠ ঃ গোড়ার দিকের পাঠ সরব পাঠ। প্রত্যেকটি অক্ষরের তথা শব্দের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুকে পড়তে শেখাতে হয়। মাতৃভাষা উচ্চারণের ব্যাপারে প্রায়ই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক দোষ এবং শিক্ষার্থী সমাজের যে-স্তর থেকে আসছে, সেখানকার উচ্চারণের নানা ত্রুটি শিক্ষার্থীর শুদ্ধ উচ্চারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তার উপর শিক্ষার্থীর নিজস্ব দোষও থাকতে পারে ; যেমন—তোত্‌লামি, টেনে-টেনে কথা বলা, নাকীসুরে কথা বলা ইত্যাদি। শিক্ষককে মাতৃভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে ছাত্রকে পড়তে শেখাতে হবে। সহানুভূতি দিয়ে, ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে শিশুর উচ্চারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং আঞ্চলিক দোষগুলি দূর করতে হবে।

শিশু শিক্ষার্থীকে শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানোর ব্যাপারে ছড়া এবং কবিতার আবৃত্তি, গান এবং ছোটখাটো অভিনয় প্রচুর সহায়তা করে। তাই ছোট্ট ছেলেমেয়েদের বাছাই করা ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করতে, গান করতে, ওদের উপযুক্ত বিষয়বস্তু-সম্বলিত নাটিকার অভিনয় করতে শেখানো দরকার। এগুলি ওদের আত্মপ্রকাশের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, তাই এসব ব্যাপারে ওদের অখণ্ড আগ্রহ।

শ্রেণীকক্ষে সরব পাঠের ব্যাপারে অনেকে সমবেত পাঠের পক্ষপাতী। সমবেত পাঠে কে কোথায় উচ্চারণে ভুল করছে তা' ধরা শিক্ষকের পক্ষে মুশকিল তাই এককভাবে পড়তে দেওয়াই উচিত। অবশ্য মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এবং আনন্দবিধানের জন্য ছোটদের সমবেতভাবে পাঠ করতে বলা যেতে পারে।

সরব পাঠের উপযোগিতা প্রচুর। ছাত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ, বিরাম-চিহ্ন সম্বন্ধে বোধ প্রভৃতির চর্চা সরব পাঠের মাধ্যমেই সম্ভব। সরব পাঠের মাধ্যমেই শিক্ষক বুঝতে পারেন ছাত্র পাঠ্যবস্তুর কোন্ কোন্ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে

অপরিচিত। তাছাড়া বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট করবার জন্য বাক্যের অন্তর্গত এক একটি শব্দগুচ্ছ একসঙ্গে পড়বার যে পদ্ধতি (ইংরেজীতে যাকে phrasing বলে) সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে তা আয়ত্ত করতে শিক্ষাদেবার সুযোগ পান। আবার, ইংরেজীতে যাকে বলে reading with feeling—অর্থাৎ পাঠ্যবস্তুর ভাবটি পাঠের মাধ্যমে পরিস্ফুট করা—এ বিষয়েও ছাত্রদের অবহিত করবার সুযোগ সরব পাঠের মাধ্যমেই শিক্ষকমহাশয় পেয়ে থাকেন।

সরব পাঠের ব্যাপারে একটা নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা উচিত। নিয়মটি হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের কোনো পাঠ্যবস্তু সরবে পাঠ করতে বলবার আগে শিক্ষকমশায় সেই পাঠ্যবস্তুটি এক বা একাধিকবার আদর্শপাঠ (model reading) দেবেন। স্কুলের উঁচু ক্লাশগুলিতে এ নিয়ম সবসময় না মানলেও নীচের শ্রেণীগুলিতে এ-নিয়ম অপরিহার্য।

নীরব পাঠ : নীরব পাঠের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক গতিতে নিজের মনে পাঠ করতে শেখানো। ছাত্ররা যাতে নিজে নিজে পাঠ্য বিষয়ের সামগ্রিক অর্থবোধ ও রসবোধে সমর্থ হয়, সেজন্য ইস্কুলেই নীরব পাঠের দীক্ষার প্রয়োজন। সরব পাঠে ব্যাপৃত থেকে আমরা যেন ভুলে না যাই যে শিক্ষিত লোকের পড়া এবং আমাদের জীবনভরে যে পড়া, তা সবই নীরবে পড়া। স্কুলে নীরব পাঠে দীক্ষার অভাবে দেখা যায় কলেজের মোটা মোটা বইও চেঁচিয়ে না পড়লে ছাত্রের মনঃসংযোগ সম্ভব হচ্ছে না। দেখা যায়, সে বড় হয়েও হয় সরবে না হয় নিদেনপক্ষে বিড়্ বিড়্ করে খবরের কাগজ, উপন্যাস ইত্যাদি পড়ছে। হোস্টেল-জীবনে এজন্য বহু শিক্ষার্থীকে বড়োই লজ্জায় পড়তে হয়।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে প্রাথমিক শ্রেণীগুলি নীরব পাঠে দীক্ষার ক্ষেত্র নয়। ছোটরা নীরব পাঠে মনঃসংযোগ করতে পারে না, নীরবে পড়ে তারা ভাব বা মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারে না। নীরব পাঠ ওদের পক্ষে এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। তাছাড়া শিক্ষকের অসুবিধাও অনেক। তিনি ছোটদের উচ্চারণ-ভুল, বিরামচিহ্নের বোধ—এসবে নজর দেবার সুযোগ পান না।

নীরব পাঠের বিষয়বস্তু খুব সাবধানে নির্বাচন করতে হবে। এ নির্বাচনের দায়িত্ব শিক্ষকের। নীরব পাঠের বিষয়বস্তু শ্রেণীর ছাত্রদের মানসিক মানের চেয়ে নীচু হওয়া চাই। তাছাড়া যে-বয়সে যে বিষয়ের জন্য

শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্বাভাবিক, সে-বয়সে সে-ধরনের বিষয় নীরব পাঠের জন্য নির্বাচন করতে হবে। যেমন, ছোটদের কাছে দেশ-বিদেশের ইতিহাস, নানা বীরের কাহিনী, পৌরাণিক গল্প খুবই উপাদেয়। কাহিনী এমন হবে যেন শিক্ষার্থী গল্পের নায়কের সাথে একটা সমপ্রাণতা বোধ করে। ইস্কুলে ইংরেজীতে নীরব পাঠে (supervised study) হাল্কা গল্প বা রচনা পড়াই মুখ্যতঃ বোঝায় ; মাতৃভাষায় কিন্তু নীরব পাঠের বস্তু কোন কবিতা বা প্রবন্ধ হলেও ক্ষতি নেই। কারণ, একথা ভুললে চলবে না যে বিদেশী ভাষা-চর্চার লক্ষ্যটা হচ্ছে ভাষা শেখা, মাতৃভাষা চর্চার লক্ষ্য হচ্ছে সাহিত্য-রসাস্বাদন, জ্ঞানার্জন।

নীরব পাঠের জন্য কোনো বিষয় ছাত্রের সম্মুখে উপস্থিত করবার আগে ছাত্রকে পাঠাভিমুখী করবার জন্য শিক্ষক একটি ভূমিকা দেবেন। ছাত্রদের নীরব পাঠ শেষ হলে শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন করে ছাত্রের পাঠ্য বিষয় অধিগত হয়েছে কিনা জেনে নেবেন। প্রশ্নগুলি তিনি আগে বোর্ডে লিখে দিয়ে নীরব পাঠের মাধ্যমে ছাত্রদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বল্‌তে পারেন। বলা বাহুল্য যে নীরব পাঠে ব্যাকরণ বা ভাষার কোন জটিলতা নিয়ে আলোচনা পরিহার করতে হবে।

স্বাধীন পাঠ : ক্লাসে চোখের সামনে শিক্ষার্থীকে বসিয়ে নীরব পাঠের যে দীক্ষা, স্বাধীন পাঠের সূত্রপাত তা থেকেই। স্বাধীন পাঠই হচ্ছে সারা জীবনের পাঠ। এ যেন অবারিত নীলাকাশে মুক্তপক্ষ চিত্তবিহঙ্গের স্বেচ্ছা-বিহার। এই স্বেচ্ছাবিহারের পথে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দিতে হলে তাকে প্রয়োজনমত ভাল ব'য়ের সন্ধান দিতে হবে, আভাস দিতে হবে। এ যেন গুপ্ত ধনাগারের ইঙ্গিত দেওয়া।

স্বাধীন পাঠের আসল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে ব'য়ের সমুদ্র মন্থন করতে শেখানো। উচ্চস্তরে গিয়ে কোন বিষয় বুঝতে হলে, বিভিন্ন বই থেকে সে-বিষয় সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। এই উপাদানই বিষয়টির সম্বন্ধে জ্ঞানকে ছাত্রের মনে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

জীবনে জ্ঞানতপস্বীকে একাই জ্ঞান সংগ্রহ করতে হয়। ভবিষ্যৎ জীবনে এই একা জ্ঞান সংগ্রহ করবার শিক্ষা দেওয়ার জন্যই স্বাধীন পাঠের বা ব্যক্তিগত পাঠের (private reading অবতারণা। ছাত্র সাধারণতঃ স্বাধীন পাঠ

করবে ইস্কুলের বাইরে, বাড়ীতে। স্বাধীন পাঠের পুস্তক নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে এ বিষয়ে স্কুলের সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করলে চলবে না। শ্রেণীর জন্য সযত্নে নির্বাচিত কতকগুলি পুস্তক নিয়ে রচনা করতে হবে শ্রেণী-পাঠাগার। স্বাধীন পাঠের জন্য শ্রেণী-পাঠাগার অপরিহার্য। শ্রেণীর সব ছাত্রের ক্ষমতা, রুচি ইত্যাদির খবর যেমন শ্রেণী-শিক্ষক রাখেন, শ্রেণী-পাঠাগারের সব বইয়ের খবরও তেমনি তাঁর নখদর্পণে থাকবে। তিনি সারা বছর শ্রেণীর ছাত্রদের ঐ সব বই পডবার জন্য একদিকে আগ্রহ সৃষ্টি, অন্যদিকে সুযোগদান করে যাবেন। স্বাধীন পাঠের চর্চা ইস্কুলের শুধু মূল গ্রন্থাগার দিয়ে চলে না। সেখানকার সব ব'য়ের খবর শ্রেণী-শিক্ষকের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়, গ্রন্থাগারিকের পক্ষেও সব ক্লাসের সব ছেলের ক্ষমতা ও রুচির খবর রাখা অসম্ভব। ফলে এমন হামেশাই ঘট্ছে যে-ছাত্রটি ভবিষ্যতে উৎসাহী পড়ুয়া হতে পারত, কৈশোরে কয়েকবার মূল গ্রন্থাগার থেকে ভুল বই পড়তে নিয়ে, বাইরের বই-পড়ার উপর সারাজীবনের জন্য সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পডল।

বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার দিক থেকেও পঠন-ক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে দেখা হয়েছে এবং তার বিভিন্ন নামকরণও হয়েছে—যেমন, **স্বাদনাপাঠ** (reading for appreciation), **চর্বণা-পাঠ** (critical study) এবং **ধারণা-পাঠ** বা **আয়ত্তীকরণ পাঠ** (reading for comprehension)। স্বাদনাপাঠ হল রসোপলব্ধির জন্য পাঠ। রসের আস্বাদনই এ ধরনের পাঠের মূলকথা। শ্রেণীতে কোন সার্থক কবিতা পাঠের সময় বা রসালো কোন বিষয় পাঠের সময় যে রস-সঞ্চারী পঠন-পাঠন হয়, তাই হল স্বাদনাপাঠ। এ পাঠে ব্যাকরণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থ-বিশ্লেষণ প্রভৃতি গৌণ।

স্বাদনাপাঠে রসোপলব্ধি মূল কথা, চর্বণাপাঠে বিষয়বস্তুর অনুধাবনটাই আসল লক্ষ্য। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তাশীল প্রবন্ধ পাঠই এই চর্বণাপাঠ। এখানে শব্দের অর্থ জানতে হবে, তার প্রয়োগ-কৌশল বুঝে নিতে হবে, দরকার হলে ব্যাকবণ আমদানি করতে হবে।

এরপর আয়ত্তীকরণ পাঠ বা ধারণা পাঠ। বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা তৈরি করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। খবরের কাগজ পড়া, গল্পের বই পড়া এসব হচ্ছে ধারণা পাঠ। ইস্কুলে যেসব বই দ্রুতপঠণের জন্য নির্বাচিত সেগুলির পাঠ ধারণা পাঠ। অবশ্য পাঠ্য সাহিত্য-পুস্তকেও এমন সব গল্প বা

হাল্কা রচনা থাকে, যেগুলির জন্যও ধারণা পাঠই যথেষ্ট। শ্রেণীকক্ষে দ্রুত পঠনের পরিচালনায় শিক্ষককে সরবে সক্রিয়ভাবে পড়াতেই হয় না। শিক্ষার্থীরা নীরবে পড়ে, শিক্ষক কতগুলি প্রশ্ন লিখে দেন বোর্ডে, ছাত্ররা নীরবে দ্রুত পঠনের সময় প্রশ্নগুলি অনুসরণ করে পড়ে চলে। পাঠান্তে শিক্ষক মশায় দুচারটে প্রশ্ন করেন বা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা মারফত দেখে নেন পাঠ্যবস্তু ছাত্রদের আয়ত্ত হয়েছে কিনা।

লেখা শেখানো

হাতের লেখা একটা শিল্পকর্ম। শিক্ষার সব ব্যাপারের মত এতেও লক্ষ্য রাখতে হবে এটা যেন শিক্ষার্থীর পক্ষে আনন্দদায়ক হয়। লেখা শেখায় ছবি আঁকার মতই যত্ন এবং অধ্যবসায়ের দরকার। ছবি এঁকে শিল্পী যে তৃপ্তি পান, হাতের লেখা লিখেও শিক্ষার্থী যেন সে আনন্দ ও তৃপ্তি পায়।

প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে মানুষ লেখে, আবার সেই লেখা পড়ে। পড়াটা মস্তিষ্ক ও চোখের কাজ কিন্তু লেখার ব্যাপারে মস্তিষ্ক আর চোখের সঙ্গে পেশী-সঞ্চালনের প্রয়োজন। তাছাড়া ভাল ছবি আঁকার মত লেখা ভালভাবে লিখতে গেলে কিছু সৌন্দর্যবোধ ও শিল্প-কৌশল দরকার।

লেখা শেখানোর সময় শিক্ষককে দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। একটা হচ্ছে লিখবার উপকরণগুলি যেন ঠিক হয়। শ্লেট পেন্‌সিল, সাদা বা রঙীন চক, কাগজ, কালি, বসবার ভঙ্গী সব ঠিকমত হওয়া চাই। এ আয়োজনের পর শিশুর ভেতরে দিনরাত আত্মপ্রকাশের যে লীলা চলেছে, সেই প্রবৃত্তিটিকে লেখা শেখার ব্যাপারে কাজে লাগিয়ে নিতে হবে।

লেখা আত্মপ্রকাশের একটা পথ। তাই লেখা শেখায় শিশুদের যথেষ্ট আনন্দ আর উৎসাহ স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। অক্ষর লিখতে শেখানোর আগে শিশুদের মাটিতে, মেঝেতে, বোর্ডে বা শ্লেটে হিজিবিজি আঁকতে দিলে তাদের ডান হাত ও হাতের আঙুল ক্রমশঃ কলম ধরতে অভ্যস্ত হয়। এই হিজিবিজি আঁকার পাশাপাশি চলবে অক্ষর পরিচয়। অক্ষর পরিচয় ভালো-ভাবে সমাপ্ত হলেই অক্ষর লেখার কাজ শুরু হবে। বাংলা বর্ণমালার বেশীর ভাগ বর্ণই সরলরেখা দিয়ে তৈরি। দুটি সরলরেখায় যে কোণ উৎপাদন করে শিক্ষার্থীকে সে বিষয়ে লক্ষ্য করতে শেখাতে হবে। তারপর মাত্রা-যুক্ত অক্ষর আর মাত্রাহীন অক্ষরগুলির দিকে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। শিক্ষার্থী প্রথমে সহজ ও সরল অক্ষর লিখতে চেষ্টা করবে। যেমন ব, র, ক ; তারপর আর একটু কঠিন অক্ষর যেমন গ, ঘ, য়, ষ ; এইভাবে ন, ণ, শ ; খ, ম, য, ত, ভ, জ, ড়, ড প্রভৃতি লিখতে শিখবে। স্বরবর্ণগুলোও এই সঙ্গে মিশিয়ে সোজা-চেহারার অক্ষর লেখা থেকে কঠিন চেহারার অক্ষরের লেখার দিকে যাওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, অনেক ইউরোপীয়

পণ্ডিতের মতে হেলানো অক্ষর লিখলে বা হেলানো অক্ষরে লেখা পড়লে দৃষ্টিশক্তি সহজেই খারাপ হয়। তাঁদের মতে খাড়া অক্ষরই শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞান-সম্মত। লেখা সুন্দর করবার জন্য শিক্ষার্থীকে নীচের কটি নির্দেশ মনে রাখতে হবে।

১। অক্ষরগুলি স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, এবং খাড়া হবে।

২। অক্ষরগুলি আকৃতিতে সমান হবে।

৩। অক্ষরে মাত্রা আছে কি নেই, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪। শব্দের অক্ষরগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হবে কিন্তু বাক্যের শব্দগুলিকে পরস্পর সমান দূরে লিখতে হবে।

এ-সম্পর্কে সংস্কৃতে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

সমানি সমশীর্ষানি ঘনানি বিরলানি চ।
অব্যাকুলিত মাত্রানি যো বৈ লিখতি লেখকঃ॥

অর্থাৎ অক্ষরগুলি সমান হবে, অক্ষরগুলির শীর্ষ বা মাত্রা এক সরল রেখায় থাকবে, শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হবে, শব্দসমূহের মধ্যে ফাঁক থাকবে আর মাত্রাগুলি অব্যাকুলিত অর্থাৎ uniform হবে।

অক্ষর-লেখা শেষ করে শব্দ-লেখার স্তরে এলেই প্রিয় ও পরিচিত লেখা দিয়ে সুরু করে অপরিচিত শব্দের দিকে যেতে হবে। নিজের নাম, বন্ধুর নাম, নিজের গ্রামটির নাম ইত্যাদি লিখতে শিক্ষার্থী যেমন আনন্দ পাবে, অন্যকিছু লিখতে তেমন আনন্দ পেতে পারে না। পাঠ্যপুস্তকের যে-কবিতাটি সকলের প্রিয়, যে-গল্পটি সকলকে আকৃষ্ট করে সেই কবিতা বা গল্প থেকে হাতের লেখা দিতে হবে। অন্যান্য সব পাঠ্য বিষয়ের মত হাতের লেখাকে আনন্দময় করবার জন্য শিক্ষকের উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন। যেমন ধরুন, রথযাত্রার আগের দিন হাতের লেখার ক্লাসে গিয়েই বোর্ডে লিখলেন—'আগামীকাল রথের ছুটি'। ছেলেরা এ-বাক্যটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে লিখলো। আবার, 'এ বছর আমাদের স্কুল শিল্ড জিতেছে'। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এরকম আনন্দময় বাক্য লেখানোর সুযোগ ইস্কুলে প্রচুর আসে, শিক্ষককে সেগুলোর ব্যবহার করতে হবে। আসল কথা, লেখা শেখানোর দুরূহ কাজটিতে নানা কৌশলে আনন্দ-সঞ্চার করতে হবে।

আমাদের দেশে 'হস্তলিপি' দেখে ছেলেদের লিখতে বলা হয়। এটি একটি নিরানন্দ ব্যাপার, তাই অবৈজ্ঞানিক। 'হস্তলিপি'র লেখায় প্রাণের স্পর্শ নেই,

তাই শিক্ষকের উচিত (অবশ্য যিনি হাতের লেখা লিখতে শেখাবেন, তাঁর হাতের লেখা নিশ্চয়ই সুন্দর হওয়া চাই) ছাত্রছাত্রীদের খাতায় নিজের হাতে প্রথম লাইনটি লিখে দেওয়া।

হাতের লেখা শেখানো বেশ খানিকটা অগ্রসর হলে, শ্রুতি-লিখনের আমদানি করা যেতে পারে। অনেকে ভয় করেন শ্রুতি-লিখনের সময় তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে লেখা খারাপ হয়, লেখা শেখানোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কিন্তু লিখতে শেখানো তো শুধু দীর্ঘ সময় ধরে সাজিয়ে সাজিয়ে সুন্দর অক্ষর বা শব্দ লেখা নয়। তাড়াতাড়ি সুন্দর করে লেখায় অভ্যস্ত হতেই হবে, কারণ ইস্কুলের জীবনে, ইস্কুলের পরেব জীবনে—সব সময়ই তাড়াতাড়ি সুন্দর করে লিখতে হবে।

কবিতা পড়ানো

পাঠ্যবস্তু প্রধানতঃ দু'রকমের। কতগুলি দ্বারা বুদ্ধির চর্চা হয় আর কতগুলির দ্বারা হৃদয়ের চর্চা। কবিতার আবেদন মুখ্যতঃ হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। শুধু হৃদয় কেন, কবিতার আবেদন আমাদের সমগ্র সত্তার কাছে।

কবি বস্তুজগৎ বা জীবনের কোনো সত্য সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি কবিতায় প্রকাশ করেন। কবির অনুভূতি ছাত্রছাত্রীচিত্তে সঞ্চারিত করে দেওয়া আমাদের কাজ, আর এ কাজে আমাদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে রসসঞ্চারী পাঠ। রস-সঞ্চারী পাঠেব মাধ্যমেই কবিচিত্তের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীচিত্তের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবার কবিতা দেহের কথা। কবিতায় আছে অনুভূতি বা ভাবের সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্য প্রকাশ করবার জন্য কবি শব্দ ও বাক্যাংশগুলি সযত্নে নির্বাচন করেন, অলংকার ও ছন্দের আমদানি করেন। সুন্দর শব্দ, সুন্দর ছন্দ আর তার ভিতর সুন্দর ভাব—এই হল কবিতা।

কবিতা পড়ানোর লক্ষ্য রসাস্বাদন। শুধু ভাবরসের আস্বাদন নয়, কবিতাদেহের যে রূপ সেই রূপ-সুধারও আস্বাদন। তাই কবিতা পড়ানোব সময় মনে রাখতে হবে ছাত্রছাত্রীরা যেন কবিতার **sound value, picture value, thought value** এবং **aesthetic value** অর্থাৎ ধ্বনি-মূল্য, চিত্রমূল্য, ভাবমূল্য এবং নান্দনিক মূল্য—সব মূল্যের সন্ধান পায়।

এইজন্যই কবিতা পড়ানোর সময় বিশেষ শব্দ বা বাক্যাংশের সৌন্দর্য, ছাত্রদের নজরে আনতে হবে, ভালো ভালো **expressions** বা কথা তাদের দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে, ভাব-বোধের জন্য তুলনীয় কবিতার হদিশ দিতে হবে। এই সব প্রক্রিয়ার এক কথায় নাম হল **appreciation** বা রসাস্বাদন।

সাহিত্য পাঠে একদিকে যেমন রসগ্রহণের আমন্ত্রণ আছে, অন্যদিকে তেমনি আছে প্রকাশের দায়িত্ব। **There is no impression without expression.**

ছাত্রছাত্রীরা কবিতায় ব্যবহৃত সুন্দর শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিজেরা ব্যবহার করতে শিখবে, কবিতা আবৃত্তি করতে শিখবে, সারমর্ম লিখতে শিখবে।

মাতৃভাষার সাহিত্যের সব রকম পাঠের মত কবিতা পাঠেও আমাদের লক্ষ্য থাকবে মাতৃভাষার সাহিত্যের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অনুরাগ সৃষ্টি করা। এ অনুরাগই তাদের স্বাধীন পাঠের পথে নিয়ে যাবে। এই স্বাধীন পাঠের পথে অগ্রসর হলেই তারা মাতৃভাষার সাহিত্যে তাদের যে মহৎ উত্তরাধিকার সে সম্পর্কে অবহিত হবে।

এবার শ্রেণীকক্ষে কবিতা-পাঠদানের কথা। আযোজন অংশে শিক্ষক মশায় কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠকের মনে আগ্রহেব সৃষ্টি করবেন। অনেক সময় কবিতার বক্তব্যটি অল্পকথায় প্রকাশ কবতে পাবা যায়। গাথা হলে গাথার কাহিনীটি বা কাহিনীর খানিকটা অংশ অল্প কথায় বলে নেওয়া যায়। আসল কথা, কবিতাটির জন্য আগ্রহ সৃষ্টি কবতে হবে শিক্ষার্থীর মনে। এরপবই আসৃছে কবিতাটির হৃদয়গ্রাহী সরব পাঠ। তারপর প্রতিটি স্তবক একবার সরবে পড়ে শিক্ষক স্তবকটির আলোচনা করবেন। এ আলোচনায় শব্দপ্রয়োগের সৌন্দর্য, শব্দগুচ্ছের সৌন্দর্য, ধ্বনি-সৌন্দর্য, ভাবের (thought) সৌন্দর্য প্রভৃতির দিকে ছাত্রছাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। সেইসঙ্গে কবিতার বিষয়বস্তু বা অন্তর্নিহিত ভাবের ধারণা ছাত্রদের হয়েছে কিনা জানবার জন্য প্রশ্ন করবেন। বসবোধের জন্য প্রথম প্রয়োজন ধারণা বা Comprehension. Appreciation বা রসোপলব্ধি ধারণার (comprehension) মাধ্যমেই আসবে। এইভাবে স্তবকগুলির আলোচনা শেষ হলে, শিক্ষক সমগ্র কবিতাটি আবার সরবে পাঠ করবেন এবং ছাত্রকে সরবে পাঠ করতে বলবেন।

আমরা অনেক সময় ইস্কুলে (বিশেষ করে নীচের শ্রেণীতে) কবিতা পড়াতে গিয়ে কবিতাটির গদ্যরূপ ছাত্রদের দিয়ে করিয়ে থাকি। রসবোধের জন্য অর্থবোধ প্রয়োজন, কিন্তু অর্থবোধ করতে হবে বলে, কবিতার ছন্দোময় দেহটিকে আটপৌরে গদ্যে রূপান্তরিত করতে হবে—এ ধরণের ধারণা কবিতা পড়ানোর ব্যাপারে মারাত্মক। কবিতা-দেহের গদ্যবিকৃতি রসোপলব্ধির অন্তরায়। তাই ঐ মামুলি পদ্ধতিটি অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

এরপর কবিতাটি মুখস্থ করার কথা। যে-কোন পাঠ্য কবিতাই মুখস্থ করতে হবে সব শিক্ষার্থীকে—একথা একেবারে অর্থহীন। শিক্ষক লক্ষ্য করবেন কোন কবিতাটি সত্যই শ্রেণীর সবাইকে স্পর্শ করছে, আলোড়িত করছে। শুধু সেই ধরণের কবিতাই সবাইকে মুখস্থ করতে বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে স্বাধীনতাও দিতে হবে, উৎসাহও দিতে হবে। অনেকে আছে যারা সহজে কবিতা মুখস্থ কবতে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন নেই, আনন্দ বা রসোপভোগের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তির স্থান নেই ; এতে কবিতাব প্রতি একটা বিরূপ মনোভাবই সৃষ্টি হয় ছাত্রদের মনে। তাই কবিতা মুখস্থ করার ব্যাপাবে ছাত্রছাত্রীর নিজস্ব অভিরুচি বা প্রবণতার কথা মনে রাখতে হবে শিক্ষককে।

গল্প পড়ানো

গল্প চিরদিনই মানুষেব চিত্তবিনোদনের, অবসর বিনোদনের এক চমৎকার উপায়। সভ্যতার প্রথম স্তরে পৌঁছানোর আগেই মানুষ মুখে মুখে গল্প রচনা করেছে। মুখের গল্প এক গোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীতে, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে। তখন মানুষের চলেছে পশুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আহার সংগ্রহের সংগ্রাম। সন্ধ্যায় অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে গৃহের নিরাপদ পরিবেশে গৃহস্বামী তার সারাদিনের সংগ্রামের খবব দিয়েছে পাশের সবাইকে। সে গল্পে ছিল অরণ্যের জন্তু, ছিল নানা প্রাকৃতিক শক্তির ভয়াবহ পরিচয়। সে গল্পের উদ্দেশ্য ছিল দুটি—তরুণদের কাছে বড়দের অভিজ্ঞতার খবর দিয়ে তাদের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কবে তোলা আর তাব সঙ্গে সঙ্গে অবসর ও চিত্তেব বিনোদন।

তারপর গল্প মানুষেব সভ্যতাব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। একদিন বাইবেলেব প্যারাবেল্‌স্‌, হিতোপদেশের গল্প, ঈশপের গল্প, জাতকের গল্প—ইত্যাদির যে প্রকাশ ভঙ্গি ও আঙ্গিক ছিল, আধুনিক যুগে গল্পের সে আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গীর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। ব্যক্তিমানবের জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা এবং অপরাপর নানা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে সমষ্টি মানবের অন্তরে সর্বজনীন করে সঞ্চারিত করাই গল্পকারের প্রধান দায়িত্ব। গল্পের মধ্যে উপন্যাসের বিস্তৃতি থাকে না ; মানুষের জীবনের বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং অসংখ্য অনুভূতির যে কোন একটিকে কেন্দ্র করেই গল্প সার্থক হতে পারে। কোন তত্ত্বকথা বলবার বা নীতি উপদেশ দেবার দায়িত্ব গল্পকারের নেই। গল্প যেন জীবন-আকাশ থেকে খসে-পড়া একটি উজ্জ্বল তারা।

গল্প বলতে আমরা ছোটগল্পের কথাই বলছি। ছোটগল্প সম্বন্ধে Hudson বলেছেন—'A short story must contain one and only one informing idea and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method.' ছোট গল্পে একটি মাত্র বিশেষ idea-কে প্রকাশ করতে হয়। তাছাড়া ছোট গল্পের আরম্ভে থাকে নাটকীয়তা, কোথাও থাকে না কোন শ্লথগতি, সমস্ত গল্পটি

ছেয়ে থাকে একটি উৎকণ্ঠা এবং চরম মুহূর্ত (climax) আসে স্বাভাবিকভাবে। গীতি-কবিতার মত ছোটগল্পও ব্যঞ্জনা-ধর্মী। ছোটগল্প পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যায় না—তার রেশ থাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ছোটগল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক সংজ্ঞাটি মনে রাখবার মত—

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

ছোটগল্পের বৈচিত্র্য অনুসারে ছোটগল্পকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

মনস্তাত্ত্বিক গল্প—এসব গল্পে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

রোমান্টিক গল্প—মানবমানবীর প্রেম অবলম্বন করে এ-ধরনের গল্প লেখা হয়।

রূপক গল্প—কোন সত্যকে রূপকের আবরণ দিয়ে প্রকাশ করাই এসব গল্পের উদ্দেশ্য।

সমাজ-সমস্যামূলক গল্প—সমাজের নানা সমস্যা উপস্থাপন করা হয় এসব গল্পে।

ব্যঙ্গগল্প—মানুষের নানা আচার-আচরণ ও বিভ্রান্ত চিন্তাকে ব্যঙ্গ করা হয় এসব গল্পে।

এছাড়া বৈজ্ঞানিক গল্পে বৈজ্ঞানিক সত্যের উদ্ঘাটন, ঐতিহাসিক গল্পে ইতিহাসের কাহিনী, ভৌতিক গল্পে ভূতের আজগুবি খবর পরিবেশন করাই লক্ষ্য।

এবার গল্প পড়ানোর কথা। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, কবিতার মত গল্পের আবেদনও আমাদের সামগ্রিক সত্তার কাছে। গল্প পড়াতে গিয়ে

শিক্ষকের প্রধান কাজই হবে ছাত্রের মনে সাহিত্য পাঠের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা। গল্প-পডানো যদি শিক্ষার্থীকে গল্পটি বুঝতে সাহায্য করেই শেষ হয়, শিক্ষার্থীর চিত্তে সাহিত্য-প্রীতির উদ্বোধন হিসাবে কিছু বাড়তি পাওনা শিক্ষক যদি না পান, তাহলে গল্প পডানো ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে হবে।

গল্প পড়াতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষককে সাবধান হতে হবে। প্রথম কথা, শিক্ষক যেন গল্পের সবিস্তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাহিত্য রসের হানি না ঘটান ; কারণ গল্প পড়া ও পডানো মস্তিষ্কের চর্চা নয়, একান্তভাবে হৃদয়ের চর্চা। হৃদয়কে উপবাসী রেখে মস্তিষ্কের চর্চা করলে গল্পের রসানুভূতিতে ব্যাঘাত ঘটবে। অল্পকথার, শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ আর সারাংশের রথের চাকায় গল্প যদি পিষে মারা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীব গল্পে তথা সাহিত্যে আগ্রহ এবং কৌতূহল চিরদিনের মতো নিভে যাবে।

অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষক গল্প পডাতে গিয়ে তথাকথিত কঠিন শব্দের অর্থ বোর্ডে লিখে দিচ্ছেন। কোন শ্রেণীর জন্য পাঠ্য কোন গল্পের মধ্যে এমন কোন কঠিন শব্দ থাকে না যার অর্থ সেই শ্রেণীর ছাত্রেরা বুঝতে পারে না। আর যদিও বা থাকে, তাতে গল্প-পাঠে বা গল্পের রস সম্ভোগে ছাত্রদের কোন অসুবিধাই ঘটে না। গল্প উপভোগেব ভেতর দিয়েই ছাত্রের ভাষাজ্ঞান, সাহিত্যবোধ, সার্থক রচনাশৈলীতে অধিকার প্রভৃতি নিজের অজ্ঞাতেই বাড়তে থাকে। অনেকে আবার গল্প পডাতে গিয়ে গল্পের মধ্যে কৌতুক, হাস্যরস, কারুণ্য ইত্যাদির যে উল্লেখ থাকে তাই রসিয়ে রসিয়ে ব্যাখ্যা করে রসের সংহার করেন ! এ যেন অনেকটা হাস্যরসাত্মক কাহিনী বলে, 'mark the humour'—বলার মতোই হাস্যোদ্দীপক। এ সমস্ত অনুভূতির কথা ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হয় না, তারা নিজে থেকেই এ সব অনুভব করে। এসব ছাড়াও আর একটি বিষয়ে শিক্ষকের সতর্ক হতে হবে। গল্প বলা বা পড়ানোর সময় নীতিশিক্ষা দেবার আগ্রহ পরিহার করতে হবে। গল্পের মাঝে নীতি-উপদেশের আমদানি মুহূর্তেই গল্পের সব সরসতা শুষে নিতে পারে। তাই গল্পকে গল্প হিসাবে উপভোগ করতেই শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে হবে।

এবার প্রসঙ্গ আসে শ্রেণীকক্ষে গল্পের পাঠদান কিভাবে করতে হবে। অন্যান্য পাঠের মত ছোটগল্পের পাঠেও 'আয়োজন' অংশে ছাত্রদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এমন প্রশ্ন করতে হবে যাতে গল্পটি পড়বার জন্য ছাত্রমনে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে। এই আগ্রহ জাগা-

সেটাই 'আয়োজন' অংশের লক্ষ্য। এরপর 'পাঠঘোষণা'। এ অংশে সামান্য লেখক-পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে আর সেইসঙ্গে গল্পটির মূলভাব অল্পকথায় বলা যেতে পারে। তবে ধান ভান্‌তে শিবের গীত যেন না হয়।

এবার 'উপস্থাপন'। পাঠটীকার এই অংশে শিক্ষককে অতিমাত্রায় সচেতন হতে হবে। এ অংশে থাকবে এমন কয়েকটি প্রশ্ন যার উত্তরগুলি একত্র করলে কাহিনীটি ছাত্রের নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত হয়। ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ইত্যাদিও উপস্থাপন অংশে যথাসম্ভব প্রশ্নের মাধ্যমে ছাত্রদের জানিয়ে দিতে হবে। এর পরেই 'অভিযোজন'। 'অভিযোজন' অংশে গল্পটির রসাস্বাদনই (appreciation) মূল লক্ষ্য। তাই এই অংশে এমন কোন প্রশ্ন হবে না যাতে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে। 'অভিযোজন' অংশের প্রশ্ন গল্পের চরিত্র বা চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে কবা যেতে পারে। অথবা, কোন তুলনা বা আলোচনামূলক কিছু করা যেতে পারে। এইভাবে এগিয়ে গেলে আশা করা যায় গল্পপাঠের মত রসের পাঠ ছাত্রদের বিরক্তি আনবে না এবং ছাত্ররা গল্পটির রসাস্বাদনে সমর্থ হবে।

প্রবন্ধ পড়ানো

প্রবন্ধ পড়ানো বোধহয় সাহিত্যের অন্য যে-কোন বিষয় পড়ানোর চেয়ে কঠিন। কারণ কবিতা বা গল্প পড়ানোর যে সুবিধা, প্রবন্ধে তা নেই। কবিতার আছে ছন্দোমাধুর্য, অলংকারের স্বর্ণবন্ধন, ধ্বনিজগৎ—যা পাঠককে অর্থের গভীরে পৌঁছবার পূর্বেই আকর্ষণ করে। আবার গল্পের জন্য মানুষের স্বভাব-আকর্ষণ। এক কথায় কবিতা বা গল্পেব আবেদন হৃদয়ের কাছে, আর প্রবন্ধের আবেদন মস্তিষ্কের কাছে, বুদ্ধির কাছে। কবিতা বা গল্পের আবেগ-স্রোতে সহৃদয় শিক্ষক সহজেই অবগাহন করতে পারেন। কিন্তু প্রবন্ধের বেলায় সে পথ রুদ্ধ। নিরপেক্ষ (objective) না হলে প্রবন্ধ পড়ানো ব্যর্থ হবে।

প্রবন্ধ শব্দটির অর্থই প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন—বিষয়ের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর, রূপের সঙ্গে ভাবের, ভাষার সঙ্গে বক্তব্যের। কোন তত্ত্ব বা তথ্যকে পরিপূর্ণভাবে, স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করে তোলাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কোন অকারণ বর্ণনার বা আবেগ-প্রকাশের অবাধ অবকাশ নেই প্রবন্ধে। তন্ময়তা (objectivity) প্রবন্ধকারের প্রকৃষ্ট গুণ। বিষয়-বস্তুর রসরূপ নয়, তার অন্তর-স্বরূপের উপরই প্রবন্ধকারের দৃষ্টি। তাই প্রবন্ধ পড়ানোর সময় বক্তব্যের কেন্দ্রের দিকেই শিক্ষকের নজর রাখতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় পেঁয়াজের কোয়া ছাড়ানোর মত যুক্তির বা বিষয়বস্তুর জট ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়ে শিক্ষককে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু হাতে তার ধরা থাকবে মূল ভাবটি—প্রবন্ধের মূল বক্তব্যটি।

প্রবন্ধ সম্পর্কে যা বলা হল, তা ভেবে দেখলে বেশ বোঝা যায় কবিতা বা গল্প পড়ানোর চেয়ে প্রবন্ধ পড়ানো অপেক্ষাকৃত কঠিন। কবিতা বা গল্প পাঠে ছাত্রের মন স্বভাবতঃই প্রস্তুত থাকে, কিন্তু প্রবন্ধ পাঠে সেই আগ্রহ সাধারণতঃ দেখা যায় না। তবু শিক্ষককে পড়াতে গিয়ে প্রবন্ধের রুক্ষ-কঠিন দেহ থেকে রসের ধারা ঝরাতেই হবে।

প্রবন্ধ নানারকমের হতে পারে,—যেমন জীবন চরিত, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক প্রবন্ধ অথবা কোন তত্ত্বকথা নিয়ে প্রবন্ধ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আবেদনও ছাত্রদের কাছে ভিন্ন। কোন ছাত্রের হয়ত ভ্রমণ-সাহিত্য পড়তে ভাল লাগে, কারো-বিজ্ঞান-বিষয়ক, কারো-বা অন্য কোনো

জাতীয় প্রবন্ধ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকবেই। তাই ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের ভিন্ন ভিন্ন রুচি স্বাভাবিক। ছাত্রদের পাঠ্য সাহিত্য-সঙ্কলনে বিভিন্ন জাতের প্রবন্ধ সব ছাত্রকেই পড়তে হয়। সেক্ষেত্রে রুচির স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। বিষয়ের বৈচিত্র্য আর ছাত্রমনের বৈচিত্র্যের মাঝে পড়ে শিক্ষকের অবস্থা অনেকটা ত্রিশংকুর মত। তবুও বিভিন্ন জাতের প্রবন্ধ পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমে ভ্রমণ-সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। এমন কোন শিশু নেই, ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা যার নেই। বেড়ানোর জন্য অন্ততঃ মনে মনে দুরন্তপনা ইস্কুলের বয়সে ছাত্রের মধ্যে থাকবেই। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মনের এই চাবিকাঠিটিকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারেন, তাহলে সোনায় সোহাগা।

হিমালয়-ভ্রমণ পড়াতে গিয়ে যদি কোন শিক্ষক প্রবোধ সান্ন্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'র উদ্ধৃতি বা কাহিনী অথবা 'দেবতাত্মা হিমালয়'-এর অংশ বিশেষ বা জলধর সেনের 'প্রবাসচিত্রে'র উল্লেখ করেন, তাহলে সেই পড়ানো নিশ্চয়ই রসগ্রাহী হবে। কোন ভ্রমণ সম্বন্ধে শিক্ষকের যদি নিজের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে তো কথাই নেই। ভ্রমণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়াতে গিয়ে মানচিত্রও ব্যবহার করতে হয়। ফলে, সাহিত্য-পাঠের সঙ্গে ভূগোলের অনুবন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবনী-বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, মহাপুরুষদের জীবনী—কৃতী মানুষের জীবনী জানতে সব ছাত্রেরই স্বাভাবিক আগ্রহ। বীর পূজার বয়স ওদের, শিক্ষককে এই আগ্রহ কাজে লাগাতে হবে।

প্রবন্ধ পড়ানো সম্পর্কে শেষ কথা হচ্ছে, প্রবন্ধ সরস হোক, নীরস হোক, সরল হোক, জটিল হোক, সেটি পড়বার জন্য ছাত্রমনে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য শ্রেণীকক্ষে একটু কাব্যিক বা রসিক হয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কসরৎ করতে গিয়ে যেন বিষয়বস্তুটি লক্ষ্যচ্যুত না হয়। তাহলে প্রবন্ধ পড়ানো ব্যর্থ হবে।

ব্যাকরণ পড়ানো

আগে আগে ব্যাকরণ চর্চার মধ্যে এদেশে এবং ওদেশে একটা বাহাদুরি ছিল। এদেশে বলা হত "দ্বাদশবর্ষভিঃ ব্যাকরণং অধীয়তে" আর ওদেশে মনে করা হত মানসিক বৃত্তিগুলির (যেমন যুক্তিবোধ, বিচারবোধ) উন্মেষ ও তীক্ষ্ণতা সাধনের জন্য **Grammar** একান্ত দরকার। তাই সে-যুগে **Latin Grammar** নিয়ে সারা ইউরোপে হৈ-হৈ চলেছিল, যেমন চলেছিল এদেশে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখানোর কসরৎ। আজকাল এসব ধারণা বাতিল হয়ে গেছে।

মাতৃভাষার ব্যাকরণ শেখার ব্যাপারে দু'রকম মত আছে পণ্ডিতদের মধ্যে। একদলের মতে ভাষা শেখার জন্য ব্যাকরণ শেখার দরকার নেই, কারণ সাদৃশ্য (**analogy**) দিয়েই ভাষা শেখা যায়। মানুষ মাতৃভাষা অনুকরণের সাহায্যেই আয়ত্ত করে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নেয়। একে স্বীকরণ বা স্বীকৃতি বলা যায়। অনুকৃতির পরেই আসে স্বীকৃতি। আর একদলের মত হচ্ছে ব্যাকরণ অনুকৃতি ও স্বীকৃতির মাঝে সেতুস্বরূপ। মাতৃভাষা শেখার ব্যাপারে অনুকৃতি থেকে স্বীকৃতির পথে এগোতে হলে ভাষাকে যে কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নিতে হয়, সেটা হচ্ছে ব্যাকরণ।

বাংলাভাষা অন্যান্য সব স্বীকৃত ভাষার মতই কতকগুলি সুচিন্তিত নিয়ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়মগুলির সঙ্গে পরিচয়ের জন্য ব্যাকরণ দরকার। অন্য ভাষায় ব্যাকরণ না হলে এক পা চলা যায় না, মাতৃভাষার ব্যাকরণ-জ্ঞানের প্রয়োজন এত করুণ নয়। কিন্তু তা বলে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মাতৃভাষাতেও কথা-বলা, পড়া, লেখা প্রভৃতি বিষয়ে শুদ্ধতা তথা দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যাকরণ-জ্ঞান অত্যাবশ্যক। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে শব্দের ব্যুৎপত্তি না জানা থাকলে ভুল অর্থে শব্দ প্রয়োগ করার সম্ভাবনা থাকে। ণত্ব, ষত্ব, সন্ধি প্রভৃতি না জানলে যে-কোন সময় বানান ভুল হতে পারে। বিশিষ্টার্থক শব্দের বা বাক্যাংশের আসল মানে না জানলে সেগুলির ভুল প্রয়োগ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা যে, ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকলে নিজস্ব রচনার সময় ভাষা ব্যবহারে আত্মবিশ্বাস আসে না। এইভাবে মাতৃভাষার ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যকতা স্বীকার করে নিয়েও কটি কথা মনে রাখতে

হবে। মাতৃভাষা চর্চায় আমাদের লক্ষ্য সাহিত্যের রসাস্বাদন, অন্যভাষার চর্চায় লক্ষ্য মুখ্যতঃ ভাষা শুদ্ধভাবে বলা, পড়া ও লেখা। মাতৃভাষার ব্যাকরণ-পাঠের এই যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—সাহিত্যের রসাস্বাদন, সাহিত্যে আগ্রহ সৃষ্টি—একথা ব্যাকরণ পডানোর সময় শিক্ষককে ভুললে চলবে না। ব্যাকরণের অনাবশ্যক খুঁটিনাটি যদি ছাত্রকে মাতৃভাষার সাহিত্যপাঠে বিমুখ করে তোলে, তাহলে ব্যাকরণ পাঠন সার্থক হল না বল্‌তে হবে।

আজকাল প্রতিবছর বিভিন্ন বৈয়াকরণের ব্যাকরণ বেরোচ্ছে। সব বৈয়াকরণ মনে কবছেন পূর্বপরিবেশকদের চেয়ে তিনি ব্যাকরণ-তত্ত্ব সহজ ও সরস ক'রে পরিবেশন করলেন আর এদিকে শিক্ষক আর অভিভাবকরা দেখছেন ছাত্রছাত্রীদের ব্যাকরণ পাঠের আগ্রহ বছর বছর কমছে। তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, ব্যাকরণের পঠন-পাঠনে কোথায় যেন গোলমাল থেকে যাচ্ছে! গোলমাল নিশ্চয়ই থাকছে। ব্যাকরণের ক্লাসে ঢুকে আমরা ভুলে যাই—এমন একটা বিষয়ের চর্চাব জন্য ক্লাসে গিয়েছি যেটার শেষ লক্ষ্য (ultimate aim) হচ্ছে সাহিত্য-রসাস্বাদনের পথে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দেওয়া। তাই মাতৃভাষার ব্যাকরণ বিদেশীভাষার ব্যাকরণের মত নীরসভাবে পডিয়ে আসি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্ণের উচ্চারণস্থান শেখাতে গিয়ে কোন্‌টি কণ্ঠৌষ্ঠ্য আর কোন্‌টি দন্তৌষ্ঠ্য—এ নিয়ে ঝড় তুলি। সন্ধি শেখাতে গিয়ে মার্তণ্ড, সারঙ্গ, অক্ষৌহিণী, বিম্বোষ্ঠ, পতঞ্জলি, প্রভৃতির সন্ধি শেখানোর জন্য এবং সেগুলি প্রশ্নপত্রে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ফল হয় ভাষার ক্ষেত্রে সন্ধির সত্য স্বরূপ শিক্ষার্থীরা শেষপর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এমনিভাবেই পদ পরিচয় শেখাতে গিয়ে অব্যয়ের সব উৎকট নামকরণ, সর্বনামের নিষ্প্রয়োজন শ্রেণীবিভাগ, ক্রিয়ার কালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ানোর জন্য প্রমত্ত হয়ে পড়ি; লিঙ্গ পড়াতে গিয়ে খুঁজে বের করি গৃধ্র-গৃধ্রিণী, মৎস্য-মৎসী, গার্গ্য-গার্গী আর সমাসের অধ্যায়ে খুঁজি কোথায় পুণ্ডরীকাক্ষ, সুধন্বা, পদ্মনাভ আর যুবজানি!

এ-ধরনের প্রবৃত্তি ব্যাকরণ পড়াতে গিয়ে বা ব্যাকরণের প্রশ্ন রচনার বেলায় পরিহার করতে হবে। এতে ব্যাকরণ শিক্ষা তথা ভাষাশিক্ষার উদ্বোধন না হয়ে উদ্বন্ধনেরই আয়োজন করা হয়। আসল কথা, ব্যাকরণকে সাহিত্যের অনুগামী হতে হবে। তাই যেসব শব্দ আমরা ব্যবহার করি, সাহিত্য পড়তে গিয়ে যেসব শব্দ ছাত্ররা পায় বা ভবিষ্যতে পাবে এবং নিজেরা মৌলিক রচনা

লিখতে গিয়ে ব্যাকরণের যেসব তত্ত্বের প্রয়োজন তাদের হয় বা হতে পারে— ব্যাকরণের পঠন-পাঠন সে-সবের বোধের জন্য।

উপসংহারে বলতে হয় ব্যাকরণ পড়ানোর ধারা কি হবে। প্রাথমিক স্তরে, এমনকি, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কোন ব্যাকরণ পডাবো না। কারণ শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে বাক্যগঠন ও প্রয়োগ করতে না পারা পর্যন্ত ব্যাকরণ পড়ানো যুক্তিযুক্ত নয়। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অল্প অল্প করে নবম শ্রেণী পর্যন্ত formal ব্যাকরণ পড়াবো। পদ পরিচয়, বচন, লিঙ্গ, সন্ধি, বিভক্তি, কারক, সমাস, ণত্ব, ষত্ব, কৃৎ, তদ্ধিত, বাগ্‌ধারা—এইভাবে শিক্ষার্থীর গ্রহণ ও ধারণ-শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে। দশম ও একাদশ শ্রেণীতে ব্যাকরণের যে সব অঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা এতদিন বাদ পডেছে সেগুলি পড়াতে হবে এবং সাহিত্য পডাতে পডাতে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে হবে। এই দশম ও একাদশ শ্রেণীতেই সাহিত্যের সরস স্পর্শে ব্যাকরণ সজীবতর হয়ে উঠবে।

ব্যাকরণ পডানোর পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে. ব্যাকবণ পডাতে হবে আরোহী প্রণালীতে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত থেকে সূত্র-গঠন করতে হবে, তারপব অবরোহী প্রণালীতে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় নূতন নূতন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে, বিশ্লেষণ করে সূত্রের সত্যতা পবীক্ষা করে নিতে হবে।

— —

সাহিত্যের ইতিহাস পড়ানো

মাতৃভাষায় সাহিত্য পড়াই ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য, সাহিত্যপ্রীতি তাদের চিত্তে সঞ্চারিত করে দেবার জন্য। সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ—এই সাহিত্য পাঠেরই পরিপূরক।

তবু একথা ভুললে চলবে না যে, সাহিত্যের ইতিহাস মুখ্যতঃ ইতিহাস। তাই ইতিহাস পাঠের নিয়ম মেনে যুগরেখার কথা মনে রাখতে হবে, সাহিত্যের যুগরেখার বোধ ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে। এ বোধ সুস্পষ্ট হলে, সাহিত্য-বোধ স্পষ্ট হবে।

সাহিত্যের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছে। যাঁরা এ বিষয়ে মাধ্যমিক স্তরের জন্য বই লিখেছেন তারা মামুলী পদ্ধতিতে সাহিত্যের ইতিহাসকে ভাগ করেছেন তিনটি যুগে—আদি, মধ্য, অন্ত্য। সাহিত্যপাঠে সবে যাদের দীক্ষা হচ্ছে, তাদের পক্ষে এ ধরনের যুগবিভাগ বোধের সহায়ক নয়।

মনে হয় চর্চাপদ থেকে পদাবলী—একটা একক ধরে নিলে ভাল হয়। পর পর পাঠদানে ঐ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পৌঁছে দিতে হবে। তারপর পড়াতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। এ সময় বাংলা সাহিত্যের দশদিক যেন উন্মুক্ত হয়ে গেল! প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক আরও কত কি! সাহিত্যের বিচিত্র form নিয়ে প্রতিভাবানদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

এ যুগের সাহিত্যের ইতিহাসকে গদ্য (প্রবন্ধ), উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, মহাকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন পাঠে ভাগ করে নিয়ে পড়ালে ভালো হয়।

এবার ভাববো সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকে সাহিত্যপাঠের মত সরস করব কি করে। এ-ব্যাপারে একটাই চওড়া রাস্তা—যুগবিভাগ সুস্থির করে প্রতিযুগের প্রখ্যাত লেখকদের লেখার নমুনা (যার অর্থ ছাত্রছাত্রীদের বোধের মধ্যে) ছাত্রছাত্রীদের আপন আপন সঞ্চয়নপুস্তকে সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

এইভাবে পাঠন ও সঞ্চয়নের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর মনে এ প্রতীতি অবশ্য জেগে উঠ্‌বে যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস।

রচনা শেখানো

কোন বিষয় সম্বন্ধে মনের ভাবগুলি সামঞ্জস্য রেখে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুসংবদ্ধ-ভাবে প্রকাশ করার নাম রচনা। শিল্পীর প্রকাশ যেমন তার শিল্পে, তেমনি রচনার মধ্যেই শিক্ষার্থীর মনের ছাপ ফুটে উঠে। রচনা-চর্চায় শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণ-শক্তি এবং আত্মপ্রকাশ-শক্তি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

শ্রেণীতে সব ছাত্রই সমান বুদ্ধি আর যোগ্যতাসম্পন্ন হয় না, তাই তাদের বুদ্ধি ও যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন ধরনের রচনা শেখাবার ব্যবস্থা করতে হয়। সাধারণতঃ দুরকমের ছাত্র প্রত্যেক শ্রেণীতেই দেখা যায়। একদলের থাকে হৃদয়-মাধুর্যের আধিক্য, আর একদলের থাকে বুদ্ধি-দীপ্তির আধিক্য। কাজেই উপরের ক্লাসে রচনা শেখানোর সময় ছাত্রদের এই বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধরনের রচনা শেখাতে হয়।

রচনা শেখানো সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, রচনার বিষয় নির্বাচন ব্যাপারে আমাদের নিকট থেকে দূরে যেতে হবে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রাজ্য থেকে কল্পনা ও চিন্তার রাজ্যে এগোতে হবে। রচনা শেখানো শুরু হওয়া উচিত ষষ্ঠ শ্রেণীতে। রচনা প্রথম প্রথম হবে মৌখিক। যেমন, গল্প বলা, কোন একটি বিষয় নিয়ে কথোপকথন, শ্রেণীকক্ষে কোন ছবি টাঙিয়ে সে ছবির বর্ণনা (Picture composition), খবর বলা ইত্যাদি। এই মৌখিক রচনা থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে লৈখিক রচনার দিকে। রচনা লিখবার আগে শ্রেণী-কক্ষে আলোচ্য বিষয়টির সবিস্তার আলোচনা হওয়া উচিত ; বিশেষ করে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম প্রভৃতি শ্রেণীতে এ-আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। তারপর শিক্ষার্থীকে আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে তার ভাব ও চিন্তা বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করে লিখবার নির্দেশ দিতে হবে। রচনার ভাষা যতদূর সম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল হবে। এই লৈখিক রচনার প্রথমদিকে ছাত্ররা সারাদিনের কাজের খবর লিখ্‌বে, কোন জানা গল্প লিখবে, ছবির বর্ণনা লিখতে শিখবে। এ-ধরনের রচনা তারা আনন্দের সঙ্গেই করবে। একাজ তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত বলেই রচনায় তাদের নিজস্ব গতি আসবে। তারপর সারাংশ-লিখন ও ভাব-সম্প্রসারণ। সারাংশ-লিখনের আসল কথা হচ্ছে মূল রচনার বিষয়বস্তু প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপে (clarity and brevity) প্রকাশ করা। সারাংশ-লিখনের

মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাহুল্যবর্জিত রচনারীতিতে অভ্যস্ত হয়। সম্প্রসারণ হচ্ছে মূলরচনার ভাবটিকে যুক্তি দিয়ে, প্রয়োজন হলে, ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতির নজির দিয়ে পল্লবিত করে তোলা। সারাংশ-লিখন ও ভাব-সম্প্রসারণ শেখানোর ব্যাপারে প্রথমে পাঠ্য পুস্তকের (যেমন আবশ্যিক সাহিত্য পুস্তকটির) সাহায্য নিতে হবে, পরে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যেতে হবে। এই সারাংশ-লিখন আর ভাব-সম্প্রসারণ সপ্তম শ্রেণীর শেষে বা অষ্টম শ্রেণীতে শুরু হওয়া যুক্তিযুক্ত। চিঠি লেখাও এক ধরনের রচনা। মনের কথা প্রিয়জনকে সার্থকভাবে জানানো একটা রীতিমত শিল্পকর্ম। চিঠির ভাষা এত সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া উচিত যেন পড়তে পড়তে মনে হয় লেখক নিজে উপস্থিত হয়ে কথা বলছে। সংকেত বাক্য অবলম্বন করে ছোটছোট গল্প লেখাও রচনা। ইস্কুলে রচনা শেখানোর ব্যাপারে প্রবন্ধের গুরুত্ব খুব বেশী। প্রবন্ধ রচনায় শিক্ষার্থীর চিন্তা-শক্তি এবং প্রকাশ-শক্তির চর্চা ও বিকাশ হয়। প্রবন্ধ কথার অর্থই হচ্ছে প্রকৃষ্ট বন্ধন। আমাদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির আকৃতি, কাজ, সবই স্বতন্ত্র। তবু এরা একটা নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির এই যে বন্ধন এবং এই যে স্বাতন্ত্র্য, প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও এই স্বাতন্ত্র্য এবং এই বন্ধন। প্রবন্ধের তিনটি অংশ—সূচনা, প্রতিপাদন আর উপসংহার। ইস্কুলে বাংলা পড়ানোর যে গণ্ডি তাতে চিন্তামূলক প্রবন্ধ (reflective essays) রচনাই সবশেষের রচনা। ভাল প্রবন্ধ লেখার জন্য নানা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। শিক্ষক শ্রেণীর জন্য একটি রচনা নির্দিষ্ট করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বইয়ের সন্ধান দেবেন, সেখান থেকে রচনার জন্য মাল-মসলা সংগ্রহ করতে হবে। নানা বই থেকে রচনার উপকরণ আত্মসাৎ করে নিজের স্বত-উৎসারিত ভাষায় বিষয়বস্তুটি প্রকাশ করতে হবে, তবেই রচনা সার্থক হবে। প্রবন্ধ লেখা, গল্প লেখা, পত্র লেখা প্রভৃতি শেখানোর সময় শিক্ষক খ্যাত সাহিত্যিকদের আদর্শ প্রবন্ধ, গল্প বা পত্রের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবেন। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনারীতির সঙ্গে পরিচিতি ছাত্রদের রচনা-শৈলী আয়ত্ত করতে সাহায্য করবে। আগেই বলেছি যে-কোন ধরনের রচনা হোক না কেন শ্রেণীকক্ষে তার মৌখিক আলোচনা হওয়ার দরকার। আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে ছাত্রের যেটুকু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে তাকে আলোচনা করে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, আলোচনা হবে ছাত্রদের সহযোগিতায়, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। আর একটি

কথা—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষেই রচনাটি বা রচনার একটি অংশ লিখতে দিতে হবে। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আলোচনার অব্যবহিত পরেই প্রবন্ধটি লিখতে দেওয়া উচিত নয়। ছাত্রের কাছে আমরা আশা করি তার সর্বোত্তম প্রয়াস। এ-প্রয়াস সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী আলোচনার পর প্রবন্ধটি সম্বন্ধে ভাববে, তার ভাবগুলি চিন্তা ও পাঠের দ্বারা পরিপক্ক হবে এবং তারপর নির্ধারিত দিনে সে রচনাটি বাড়িতে বা শ্রেণীকক্ষে লিখবে।

এবার প্রশ্নপত্রের কথা। প্রশ্নপত্র রচনা সম্পর্কে আমরা হামেশাই কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দিই। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে হয়তো 'কণিকা' থেকে এমন এক ভাব-সম্প্রসারণ লিখতে দিলাম, যার ভাব বোঝা বড়দেরই মুশকিল। নবম-দশম শ্রেণীতে প্রবন্ধ লিখতে দিলাম 'জমিদারী প্রথার লোপ', 'বাস্তুহারার পুনর্বাসন' ইত্যাদি। এর ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, সাধারণতঃ প্রায় ছাত্রই কয়েকটি ভাব-সম্প্রসারণ, গুটিকতক প্রবন্ধ, কয়েকটি সারাংশ-লিখন মুখস্থ করে পরীক্ষায় উপস্থিত হচ্ছে। প্রশ্নপত্রে এই ধরনের অবিবেচনা সারা বছরের রচনা লিখতে শেখানোর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারে। প্রবন্ধ লিখতে শেখানোর ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্যটা কি ? দেখতে হবে শিক্ষার্থী তার বয়স ও প্রত্যাশিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে গুছিয়ে স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করতে শিখেছে কিনা এবং নিজের চিন্তাকে শুদ্ধ সুন্দর স্পষ্ট ভাষায় বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সাজিয়ে লিখতে পারছে কিনা।

রচনা শেখানোর ব্যাপারে একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে সঞ্চয়ন পুস্তক। কোন ভাল লেখা পড়তে পড়তে যে অংশটুকু ছাত্রের ভাল লাগবে, সেটি সে সঞ্চয়ন-পুস্তকে টুকে রাখবে। এই সঞ্চয়ন পুস্তকে সাধারণতঃ থাকবে ভাল ভাল কবিতা বা কবিতার অংশ, মনীষীদের বাণী, সুন্দর ভাব, সুন্দর উক্তি, সুন্দর বর্ণনা ইত্যাদি।

এই স্বয়ং-সঞ্চয়ন মাতৃভাষা চর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান। এই সঞ্চয়ন একদিকে যেমন তার চিন্তার পুষ্টি জোগাবে, তেমনি অন্যদিকে তার ভাষা, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদিতেও সৌন্দর্য ও শক্তি এনে দেবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন, জীবন গঠন—ইত্যাদি ব্যাপারে এই সঞ্চয়নের যে অব্যর্থ পরোক্ষ মঙ্গলময় প্রভাব, তা এখানে নাই-বা আলোচনা করলাম।

এখন প্রশ্ন, সঞ্চয়নের দীক্ষা কিভাবে দেবেন, এর পরিচালনাই বা কি ভাবে হবে? প্রথমেই বলতে হয়, এটা সপ্তম শ্রেণী থেকে শুরু হতে পারে, তার আগে

নয়। পড়াতে পড়াতে সুযোগ হলেই শিক্ষক নির্দেশ দেবেন কোন সুন্দর কথা বা সুন্দর কবিতা সঞ্চয়ন পুস্তকে লিখে রাখতে। অথবা তিনি একদিন শ্রেণী-কক্ষেই পাঁচ-সাতটি ভাল উক্তি বা কবিতার অংশ বোর্ডে লিখে ছাত্রদেব সঞ্চয়ন কাজ আরম্ভ করিয়ে দিতে পারেন। মাঝে মাঝে ছাত্রদেব সঞ্চয়ন পুস্তকগুলি নিয়ে শিক্ষক দেখবেন তাদের সঞ্চয়ন কিভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রথম দিকটায় সঞ্চয়নে অনেক অতি সাধারণ, সঞ্চয়নের অযোগ্য কথাও ছাত্ররা হয়তো সযত্নে সংগ্রহ করে বসবে। কিন্তু এজন্য তাদের নিরুৎসাহ করবাব প্রয়োজন নেই। সুষ্ঠু সঞ্চয়ন আপনা থেকেই ধীরে ধীরে আসবে। কারো কোন ভাল সঞ্চয়ন চোখে পডলে শিক্ষকমশায় সমগ্র ক্লাসকে সেটি পডিয়ে শুনিয়ে দেবেন, কখনো-বা লিখে নিতে নির্দেশ দেবেন। এ-ব্যবস্থা ছাডাও স্কুল পত্রিকায় স্বয়ং সঞ্চয়নের জন্য একটু পৃথক স্থান থাকবে। সেখানে সংগ্রাহকদের নাম উল্লেখ করে, ভালো ভালো সঞ্চয়নগুলি প্রকাশ করতে হবে। এ-ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সংগ্রাহকরা উৎসাহিত হবে, অন্যদিকে তাদের ভালো সংগ্রহগুলি বিদ্যালয়েব সব ছাত্রকে পরিবেশন করাও হবে।

সাহিত্যিক কার্যাবলী

মাতৃভাষা চর্চাব গুরুত্ব সম্পর্কে পুস্তকেব প্রথম নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এবার মাতৃভাষা চর্চার উদ্দেশ্যগুলি পর পর সাজিয়ে বলা হচ্ছে।

মাতৃভাষা চর্চার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ কথা বলে নিজেব মনোভাব প্রকাশ করা। দ্বিতীয়তঃ, অপরে যা বলছে তার মর্ম গ্রহণের শক্তি অর্জন করা। তৃতীয়তঃ, বই পড়ে তার অর্থ গ্রহণ করা ও সাহিত্য পাঠে অনুরাগী হওয়া। চতুর্থতঃ, লিখনের মধ্য দিয়ে চিন্তা, যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতি ক্ষমতাগুলির চর্চা করা ও সেগুলি যাতে বিকশিত হয় তার চেষ্টা করা।

মাতৃভাষা চর্চাব একটা বড উদ্দেশ্য এবং শেষ উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে মৌলিক বচনাব বৃহত্তব ক্ষেত্রে এগিয়ে দেওযা। মৌলিক রচনা সৃষ্টির অংকুর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে থাকে, এ বিষয়ে আগ্রহও তাদের থাকে। শিক্ষকের কাজ শুধু ঐ অংকুবটিকে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের এগিযে দিতে পাবলে বিদ্যালয়ের স্তবে মাতৃভাষার সাধনা অনেকটা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

এ আলোচনায় প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, মাতৃভাষা চর্চার বহুমুখী উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে শুধু পাঠ্য-উপপাঠ্য পুস্তকগুলির উপর নির্ভর করলে চলবে না। মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চা সম্পর্কিত যে বিচিত্র কর্ম-পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা ছাত্রের বহুমুখী বিকাশের সহায়ক সেই সব বিচিত্র সাহিত্যিক কর্মকে ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিতে হবে এবং সহপাঠ্যসূচী হিসেবে সেগুলিকে মূল্য দিতে হবে।

অবশ্য সাহিত্যিক কার্যাবলী সংগঠন করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়। তা যেন ছাত্রের আগ্রহ, কৌতূহল, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা, যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ, কল্পনাশক্তি, সৃজনীপ্রতিভা, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি চিত্তবৃত্তিগুলির বিকাশের সহায়ক হয়। আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ছেলেরা যেন সাহিত্যিক কাজগুলিতে স্বাধীনভাবে, স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে, আনন্দিতভাবে যোগদান করে। তাহলেই সাহিত্যিক কার্যাবলী সৃজন-ধর্মী হয়ে উঠবে।

সহপাঠ্যসূচীতে এমন সব সাহিত্যিক কর্মকে স্থান দিতে হবে যেগুলি বিনা ব্যয়ে বা অল্পব্যয়ে সম্ভব। শুধু শহরে নয় গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতেও যাতে বর্তমান অবস্থায় এগুলির প্রয়োগ সম্ভব হয় ও প্রকৃতপক্ষেই ছাত্রগণের সাহিত্য অনুশীলনের অনুকূল হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

নীচে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত কয়েকটি ভাষা ও সাহিত্যচর্চা সম্পর্কিত কাজের উল্লেখ করা হল।

(ক) সাহিত্যিক কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নাট্যায়ন এবং অভিনয়। সার্থক নাট্যায়ন এবং অভিনয়ের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয় দস্তুরমত প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। পাঠদানের সার্থকতার জন্য আমরা visual aid-এর কথা ভেবে থাকি। যখন কোন গল্প বা গাথা চোখের সামনে সজীব হয়ে উপস্থিত হয়, তখন সেটা বোধহয় চূড়ান্ত visual aid ! এবং এ জন্যই নাট্যায়ন এবং অভিনয়ের মাধ্যমে গল্প বা গাথার বিষয়বস্তু, চরিত্র, সংলাপ—সবকিছু ছাত্র-ছাত্রীদের সার্থকভাবে অধিগত হয়ে যায়। এর উপর আছে যৌথকর্মের নিশ্চিত বাড়তি পাওনা—আনন্দ এবং সমাজীকরণ (Socialisation). শিক্ষা একটি আনন্দঘন প্রক্রিয়া। শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ মনের মত হলে তাতে আনন্দ উব্‌ছে পড়ে। নাট্যায়ন ও অভিনয় হচ্ছে সেই আনন্দঘন প্রক্রিয়া, খেলাচ্ছলে সার্থকভাবে পাঠ্যবস্তুর চর্চা।

বিদ্যালয়ে পাঠ্যবস্তুর নাট্যায়ন ও অভিনয় সম্পর্কে ক'টি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ, এমন গল্প-গাথা বেছে নেবো যাতে নাট্যগুণ আছে—action আছে, অল্পবিস্তর সংঘাত আছে। দ্বিতীয়তঃ, কাহিনীগুলির সঙ্গে ছাত্রদের অভিজ্ঞতার খানিকটা যোগ থাকা প্রয়োজন।

নাট্যায়নের সময় মনে রাখতে হবে যে, নাটকের গোড়ার দিকে গল্পটিকে সতর্কভাবে অনাবৃত করতে হবে (exposition), তারপর কাহিনী এগিয়ে যাবে তার চরম সীমার (climax) দিকে। তারপর ধীরে ধীরে পৌঁছবে শেষ পরিণতিতে। নাটকটি খুব করুণরসের হলে কিছু লঘুরসের (relief) অবতারণা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীরা স্বকপোলকল্পিত দু'একটি চরিত্র এবং সামান্য ঘটনা আমদানি করে এই লঘুরসের ব্যবস্থা করতে পারে।

এ সম্পর্কে আরও দু'একটি কথা মনে রাখা ভাল। ছাত্রছাত্রীদের অভিনয় স্কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। একথা তাদের ভাববার সুযোগ দেবার দরকার নেই যে, বাইরের বড়দের জন্য তারা অভিনয় করছে। নাট্যায়ন

অভিনয় ব্যাপারে আমাদের উগ্র কর্তৃত্ব বর্জন করে ছাত্রছাত্রীদের বয়োজ্যেষ্ঠ একজন হিসেবে কাজ করতে হবে। সমস্ত প্রেরণা, উৎসাহ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্রছাত্রীদের থেকেই আসবে, আমরা শুধু প্রয়োজনবোধে নরমগলায় নির্দেশ দেবো।

(খ) সাহিত্য সভা : স্কুলে অন্ততঃ মাসে একবার সাহিত্য সভা করা যেতে পারে। সভার বহু পূর্বেই ছাত্রদের জানিয়ে দিতে হবে সভার আলোচ্য বিষয় কি—কোন সাহিত্যিকের কোন উপন্যাস বা গল্পগুলি ; বা কোন কবির কোন কবিতা পুস্তক। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক পর পর দুটি মাসিক সাহিত্য সভায় "কথা ও কাহিনী"র কবিতাগুলি পাঠ করা, হ'ল ওগুলি নিয়ে আলোচনা করা হ'ল। আবার ধরা যাক বিভূতিভূষণের ছাত্রবোধ্য তিনটি গল্প পাঠ হ'ল, বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী নিয়ে আলোচনা হল। বড়ো মানুষের জন্মদিন পালন করতে গিয়েও কিছু সৃজনশীল রচনা, কিছু সাহিত্য-চর্চা হতে পারে। এসব আয়োজনে শিক্ষক ছাত্র দু' পক্ষকেই সক্রিয় অংশ নিতে হবে। মাঝে মাঝে নামকরা সাহিত্যিকদের বা সমালোচকদের আমন্ত্রণ করেও সাহিত্য সভায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করা যেতে পারে। এ ভাবেই ছেলেমেয়েদের সাহিত্য রসস্বাদনার ক্ষমতা বাড়বে, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা, যুক্তি বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতার বিকাশ হবে এবং সর্বোপরি সাহিত্যপাঠের ব্যাকুলতা বেড়ে যাবে।

(গ) বিতর্ক সভা : মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে বিতর্কের ব্যবস্থা রাখা ভাল। বিতর্ক দু'প্রকারের হতে পারে, অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন বিষয় সম্পর্কে বিতর্ক এবং কোনো বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে প্রস্তুত হয়ে বিতর্ক। এতে আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ে, কোনো বিষয় সম্বন্ধে গুছিয়ে দুকথা বলার ক্ষমতা বাড়ে, যুক্তিশক্তির বিকাশ হয়।

(ঘ) সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা : বছরে অন্ততঃ একবার স্কুলে সাহিত্যিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এতে প্রতিযোগিতা থাকবে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা লেখার এবং কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাতৃভাষার ও সাহিত্য চর্চার অসংখ্য দিক উন্মোচিত হয়ে যাবে। চিন্তা শক্তি, আত্মপ্রকাশের শক্তি, রসগ্রহণ ও রসপরিবেশনের শক্তি এবং আরো কত কি ক্ষমতা এর দ্বারা বৃদ্ধি পাবে।

(ঙ) প্রাচীর পত্র রচনা ঃ প্রাচীর পত্র হবে ছেলেদেরই হাতে লেখা পত্রিকা। প্রাচীর পত্রিকা অন্ততঃ তিনমাসে একবার প্রকাশ করা উচিত। স্কুলে নীচের দিকের শ্রেণীগুলিকে নিয়ে একটি এবং নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর একটি প্রাচীর পত্রিকা হলে ভাল হয়। প্রাচীব পত্রিকার জন্য লেখা সব সময় ছোট হবে। গল্প, রহস্য-কাহিনী, বম্যরচনা, সমালোচনা, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী এতে থাকবে। আব থাকবে বিদ্যালয়েব বিচিত্র কার্যকলাপেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(চ) বার্ষিক পত্রিকা ঃ প্রত্যেক স্কুলেই একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশেব ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকাব। ছাত্র ও শিক্ষকমশায়দেব রচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হবে। প্রাচীব পত্রেব ভাল ভাল বচনাগুলি এতে মুদ্রিত আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা কবা যেতে পাবে।

(ছ) সংকলন-পুস্তিকা বা স্বয়ং-সংকলন সম্পর্কে 'রচনা-শেখানো' অধ্যায়ে আলোচনা করা হযেছে। উপরে সাহিত্যিক কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্য চর্চাব ব্যক্তি-জীবনে যে চরম সুফল সেগুলি এসব কার্যাবলীব মাধ্যমে লাভ হবে। তাছাডা এইসব কার্যাবলীর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেব রুচি ও সৌন্দর্যবোধ, দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ এবং সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটবে।

এগুলি ছাড়াও উৎসাহী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে স্কুলে বিভিন্ন প্রকারের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাহিত্য চর্চা করা যেতে পারে। যেমন বৎসরের শুরুতে নবীন বরণ উৎসব, বর্ষায় বর্ষামঙ্গল, শরতে শারদোৎসব ইত্যাদি উৎসবগুলিকে অবলম্বন করে সঙ্গীত পরিবেশন, বক্তৃতা, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয় কৌতুকাভিনয় ইত্যাদি পরিবেশন করা যেতে পারে।

সাহিত্যিক কার্যাবলীর মূল দায়িত্ব থাকবে ছাত্র-সংসদের উপর। শিক্ষক শুধু পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবেন। তাহলে শিক্ষকের নির্দিষ্ট কর্তব্যের পরেও এ কাজের জন্য বিশেষ চাপ সৃষ্টি হবে না। অবশ্য কাজগুলি যাতে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হয় সেদিকে শিক্ষকগণ সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

বানান সমস্যা

বানান শুদ্ধি ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অপরিহার্য। আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচুর বানান ভুল হয়। এটা বোধ করতে হলে এর কারণ এবং প্রতিকারের কথা চিন্তা করতে হবে।

বাংলা একটি মিশ্র ভাষা। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণে বাংলা ভাষা তৈরী। কোন এক ভাষার নির্দিষ্ট বর্ণমালা কোন মিশ্র ভাষার উচ্চারণের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে না। বাংলা ভাষায় এত বানান ভুলের প্রধান কারণই হচ্ছে আমাদের উচ্চারণানুগ বর্ণমালা নেই। আমরা সংস্কৃত বর্ণমালা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি।

বাংলা বর্ণমালা স্থিতিশীল কিন্তু উচ্চারণে নানা পরিবর্তন নিয়তই ঘটছে। শিক্ষার্থীর বানান ভুলের এটি অন্যতম কারণ। সংস্কৃত থেকে আমরা বর্ণমালা পেয়েছি। সংস্কৃতের প্রত্যেকটি বর্ণ একটি বিশিষ্ট ধ্বনির দ্যোতক। সেখানে জ—য, ন—ণ, ষ—শ—স ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য উচ্চারণে বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় সব একাকার। অথচ এরা বাংলা বর্ণমালা জুড়ে বসে আছে। তাই আজ এদের নিয়ে বাংলায় ভুলের অন্ত নেই। ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা নিয়েও মুশ্‌কিল। বর্ণ দ্বিত্ব করে যে উচ্চারণ পাওয়া যায় বর্ণের সাথে ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা যোগ করেও সেই দ্বিত্ব উচ্চারণই পাওয়া যায়। কেবল ম-ফলার ক্ষেত্রে উচ্চারণে একটা লঘু অনুনাসিক ধ্বনি অনেক সময় থাকে।

এছাড়া সম্মুখ, হঠাৎ, সমষ্টি, অনটন, দুরবস্থা ইত্যাদি শব্দের বেলায় আমাদের নিজস্ব উচ্চারণ-দোষ বানান ভুল ঘটিয়ে থাকে।

সংস্কৃতের হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্ণগুলি নতুনতর জটিলতার সৃষ্টি করেছে। বাংলা বর্ণমালায় এগুলি বজায় থাকলেও বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে এগুলির পার্থক্য বজায় রাখা হয় না, সম্ভবও নয়। রাত্রি, ধাত্রী, পিপীলিকা, বিভীষিকা, মনীষী, মুমূর্ষু—এরা সব সময়ই বিভ্রাটে ফেলে।

তৎসম শব্দের বানান ভুলের একটা প্রধান কারণ ব্যাকরণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। ণত্ব, ষত্ব এবং সন্ধি প্রভৃতি জানা থাকলে এ ধরনের ভুল অনেকটা নিবারণ করা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কারের যে তালিকা করেছিলেন, তা কতগুলি পাঠ্যপুস্তকে অনুসৃত হয়েছে, কতগুলিতে হয়নি। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে

বানানের বিভিন্নতা শিক্ষার্থীর মনে জটিলতার সৃষ্টি করছে এবং তার ফলে এক নতুন ধরনের বানান ভুল আমদানী হয়েছে ছাত্র সমাজে।

বানান ভুলের ব্যাপারে পরিবেশের প্রভাবও কম নয়। ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানের নাম বা জিনিসের নামের ভুল বানান বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন। ছোটরা যখন খবরের কাগজে, পত্রিকায় বা রাস্তার দুপাশের বিজ্ঞাপনে এসব ভুল বানান পড়ে, তখন তাদের মনে এই বানানগুলি আঁকা হয়ে যায়। তাদের এ বানান ভুল পরে সংশোধন করা খুব দুরূহ হয়ে ওঠে।

বানান ভুল নিবারণ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মনে শুদ্ধ বানানের জন্য আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা এবং শুদ্ধ বানানের মূল্য তাকে বুঝিয়ে দেওয়া। বানান শুদ্ধির জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজনকেই যত্নশীল হতে হবে। এই আগ্রহ ও যত্নের ফলেই আমাদের ইংরেজী বানানে বাংলা বানানের চেয়ে অনেক কম ভুল হয়। উচ্চারণ দোষে যেসব বানান ভুল হয় (যেমন সম্মুখ, হটাৎ, সমষ্ঠি, অনাটন, দুরাবস্থা, অত্যান্ত ইত্যাদি।) সেগুলি সংশোধন করতে হলে প্রথমে শুদ্ধ উচ্চারণে ছাত্রকে অভ্যস্ত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে উচ্চারণানুগ বানান লিখিয়ে শুদ্ধ বানানের স্বরূপটি আয়ত্ত করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ছাত্রছাত্রীরা ভুল উচ্চারণ করে 'ব্যেক্তি', 'ব্যাবসায়', ব্যাবহার ইত্যাদি লিখলেও, এক্ষেত্রে বানান-মাফিক উচ্চারণ বাংলায় হাস্যোদ্দীপক। তাই এগুলির বেলায় উচ্চারণে বানানে প্রভেদটুকু স্বীকার করে নিয়ে শুদ্ধ বানান সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে হবে।

পড়ানোর সময় বানানের বৈশিষ্ট্যের দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বানান ভুল হয় এমন কোন শব্দ শিক্ষক যদি পড়াতে পড়াতে পান, তাহলে সেই জাতীয় আরও প্রচুর শব্দ উল্লেখ করে ছাত্রদের মনে বানানটির বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত করে দিতে হবে। যেমন, 'উপকারিতা' কথাটি পেলেই 'প্রতিযোগিতা' 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' প্রভৃতি অনুরূপ শব্দের বানান-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হবে। আর এই সঙ্গে উপকারী, প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী আবার উপকারিগণ, প্রতিযোগিদল, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, প্রতিযোগীরা প্রভৃতি শব্দগুলিরও উল্লেখ ও বানান-আলোচনা করতে হবে। মূল কথা হচ্ছে শুদ্ধ বানান শেখানোর কথা মনে রেখে শিক্ষককে ব্যাকরণ পড়াতে পড়াতে সাহিত্যে ফিরে যেতে হবে, আবার সাহিত্য পড়ানোর সময় প্রয়োজনবোধে ব্যাকরণের

বিভিন্ন নিয়মের আলোচনা করতে হবে। কঠিন বানান লিখে লিখে অভ্যাস কবতে হয়। লেখার কাজে ইন্দ্রিয়শক্তি, পেশী ও স্মৃতি একসঙ্গে কাজ করে। পরে অভ্যাস হয়ে গেলে শুধু পেশীর প্রভাবেই লেখার কাজ সম্পন্ন হয়। তাই শুধু মুখস্থ করে নয়, লিখে লিখে শুদ্ধ বানান অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু কি দেখে লিখবে? ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে তো একাজ এযুগে চলবে না। তাই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষার মান মনে বেখে প্রয়োজনীয় শব্দের একটি বিজ্ঞান-সম্মত তালিকা তৈরী করা এবং সেই তালিকার শব্দ দিয়েই বানান-শেখানো শুরু কবা। কিন্তু বানান শেখানোর জন্য বয়স ও শিক্ষার মান অনুসারে শিক্ষণীয় শব্দ-সম্ভাবের তালিকা তৈরী করাব মত এত সময় ও শ্রমের সুযোগ শিক্ষকেব থাকে না। তাই এই তালিকা প্রস্তুতির কাজে এগিযে আসতে হবে দেশেব শিক্ষা-অধিকারকে—মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে।

ইংরেজীতে শিক্ষার্থীর বযসেব মাপে তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য শব্দ নিয়ে লেখা পাঠ্যপুস্তকের প্রচলন আছে। অনেকে বাংলাতেও এই ধবনের পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজনবোধ করেছেন। কিন্তু বাঙালী-ছাত্র মাতৃভাষা পড়তে গিয়ে অমন কবে হাটি-হাটি-পা-পা করে চলবে—একথা ভাবাই চলে না! বানান ভুলের ভযে বাঙালী শিক্ষার্থীব পাঠ্য সাহিত্য যদি এরকম ফবমাশী সাহিত্য হয়, তাতে সাহিত্য-রস-সম্ভোগে মারাত্মক ব্যাঘাত হবে। ফলে ইস্কুলের ইংরেজীর মত ইস্কুলের বাংলাতেও তার বিতৃষ্ণা আসবে।

বানান শেখার ব্যাপারে অন্ততঃ নীচের ক্লাসগুলিতে শ্রুতি-লিখনের মূল্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। সপ্তাহে একবার কি দু'বার বাংলা পড়ানোর পিরিয়ডে শ্রুতি-লিখনের চর্চার ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীর বানান ভুল অনেকাংশে কমান যেতে পারে। কিন্তু শ্রুতি-লিখন কিভাবে হবে? শ্রুতি-লিখন প্রথম প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাছাই করা অংশ থেকে (অর্থাৎ সে সব অংশে বানান ভুল হতে পারে এ রকম দু-চারটা শব্দ অন্ততঃ আছে) লিখতে দিতে হবে। ক্রমে বাইরের বই থেকেও দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক প্রথমে লেখা বিষয়টি কয়েকবার ধীরে ধীরে পড়বেন। তারপর ঐ রচনার মধ্যে যে সব বানানে বৈশিষ্ট্য-যুক্ত শব্দ আছে সেগুলি বেছে বোর্ডে লিখে তাদের বানান-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করবেন। তারপর শ্রুতি-লিখন লিখতে দেবেন। পাঠ্যপুস্তক থেকে লিখতে দিলে, ছাত্ররা নিজেরাই ব'য়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিজেদের ভুল সংশোধন করে নেবে।

স্কুলের নির্দিষ্ট একটা বোর্ডে (এমন জায়গায় টাঙাতে হবে যেন সব ছেলের নজরে আসে) মাঝে মাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের যে সব বানান ভুল হচ্ছে, সেগুলির শুদ্ধরূপ স্কুলেরই কোন ছেলেকে দিয়ে সুন্দর করে বড় বড় হরফে লিখিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া মন্দ নয়। কিন্তু এজন্যে এবং বাংলা পড়ানো সম্পর্কিত অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকদের Conference বা সম্মেলনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

এই বানান ভুল নিবারণ প্রসঙ্গে একটি কথা এসে পড়ে। ছেলেদের পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বইগুলোতে 'অশুদ্ধি-সংশোধন' নামে একটা অধ্যায় থাকে। সে অধ্যায়ে শব্দগুলির শুদ্ধ বানান আর সম্ভাব্য অশুদ্ধ বানান পাশাপাশি দেওয়া হয়। এটা একটা মারাত্মক রকমের অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। শব্দের শুধু শুদ্ধ রূপটির সঙ্গে বারবাব শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটিযে সেই রূপটিতে তাকে অভ্যস্ত করতে হয়। তা না হলে শব্দের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুটি রূপ পাশাপাশি দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুদ্ধ রূপটি সম্পর্কে ছাত্রের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে গ্রন্থকার আর প্রকাশক মহল সচেতন না হলে আপাততঃ শিক্ষক ও অভিভাবকরা শব্দগুলির অশুদ্ধ বানানে কাগজ চিটিয়ে সেগুলিকে শিক্ষার্থীর চোখের আড়াল করা ছাড়া উপায় নেই। দেশের লোকের লেখা ইংরেজী ব্যাকরণ ও রচনার বইতেও নেসফিল্ড আর রো সাহেবের অনুকরণে 'Correction of errors' অধ্যায়ে এই একই ধরনের ভুল পথ অনুসরণ করা হচ্ছে।

বানান সম্বন্ধে কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম রচনা করছেন তা নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

১। তৎসম, তদ্‌ভব, দেশী, বিদেশী সকল জাতের শব্দেই রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন করতে হবে।—যেমন অর্চনা, মূর্ছা, অর্ধ, সর্ব, কর্জ, শর্ত, পর্দা, জার্মান।

২। শব্দের শেষে সাধারণতঃ হল্‌-চিহ্ন দেওয়া হবে না। যেমন—পকেট, চেক, করিস ইত্যাদি। ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্‌ চিহ্ন দিতে হবে। যেমন—বগুড্‌, ত্‌খ্‌ত্‌, শাহ্‌।

৩। মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ, ঊ থাকলে, তদ্‌ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ, ঊ অথবা বিকল্পে ই, উ হবে—কুমীর, পাখী, পূব অথবা কুমির, পাখি, পুব।

৪। কতগুলি শব্দে য না লিখে জ লেখা বিধেয়—কাজ, জাউ, জাঁতা, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোত, জোয়াল।

৫। অসংস্কৃত শব্দ কেবল ন—কান, বামুন, শোনা, কোরান, কার্নিশ, কিন্তু যুক্তাক্ষরে ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ড চল্‌বে—ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা।

৬। ও-কার ও ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জনীয়। তবে অর্থ গ্রহণে বাধা হলে চলতে পারে, মত, মতো, ভাল, ভালো; পড়ো, প'ড়ো।

৭। ঙ্গ ও ঙ দু রকমই চলবে। বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন। হসন্ত ধ্বনি হলে ঙ স্থানে ং বিধেয়, যেমন—বাংলা।

৮। মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে শ, ষ, স হবে। যেমন—আঁশ (অংশ), আঁষ (আমিষ), মশা, (মশক), সরিষা (সর্ষপ)।

বানান প্রসঙ্গে একটা বড় কথা হচ্ছে—অভিভাবক ও শিক্ষকরা বানান ভুল নিয়ে 'হায়! হায়!' যতটা করছেন, ভুল শোধরাবার চেষ্টা ততটা করছেন না। কারণ সাহিত্য ব্যাকরণ পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থীকে সামান্য মেহনতে বানান সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া যেকোন একটা বছর ধরে যদি ইস্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বানান-ভুলের একটা হিসেব রাখেন এবং সেইমত একটা তালিকা তৈরী করেন, আর সেই তালিকা-ভুক্ত শব্দগুলির বানান শেখানো সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, তাহলে বানান শেখানোর জন্য কোন বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজনই হয় না।

বাংলা বানান-সমস্যা সম্পর্কে শেষের কটি কথা বলা দরকার। চল্‌তি বাংলা শব্দের বানানে জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছাচারিতা চলেছে; চলতি বাংলার বানানে অনেকটা স্বাধীনতা আছে সত্যি, কিন্তু শৃঙ্খলাও থাকা দরকার। নীচে কতগুলো উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

Hospital থেকে হাসপাতাল শব্দটা এসেছে এতে চন্দ্রবিন্দুর ( ) প্রয়োজন নেই। হাসপাতাল হাঁসদের জন্য নিশ্চয়ই নয়! তেমনি ইট, হাসি, কাচ ইত্যাদিতেও চন্দ্রবিন্দু সঙ্গত নয়।

পোষণ, তোষণ—এরা তৎসম শব্দ। তাই বলে পোশাক, পাপোশ, বালাপোশ, তোশক ইত্যাদিতে ষ-এর হেতু নেই। এগুলিতে 'শ' লেখা উচিত।

'বাণী'-শব্দের অর্থ—কথা, উপদেশ-সংবলিত উক্তি, সরস্বতী। এ বাণীর সঙ্গে ভবানী, মেহেরবানি, গয়নার বানি প্রভৃতি শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। তাই এগুলিতে 'ন' ব্যবহার করতে হবে।

তেমনি গুণ-এর সঙ্গে সেগুন, বেগুন, আগুন, ফাগুনের কোন সম্পর্ক নেই। তাই এগুলিতেও 'ন' লিখতে হবে।

বাংলা 'র'-এর উচ্চারণ দন্ত্য। কাজেই পুরানো, ঘুরানো, ফিরানো, জিরানো, চিরুনি, নরুন, মেথরানী, চাকরানী, ঠাকুরানী, পূজারিনী, ট্রেন, ড্রেন, বার্নিস, কার্নিস ইত্যাদি শব্দে 'ণ' লেখার কোন কারণ নেই।

লুণ্ঠন-এ 'ঠ' থাকলেও লুঠ্ না লিখে 'লুট' লেখাই বিধেয়, তেমনি কাঁঠাল নয়, কাঁটাল ('কণ্টকী' থেকে এসেছে)। এ-ধরনের উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। তাই বাংলা বানানে এ-ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে বাংলা ভাষার শিক্ষক ও ছাত্রদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics)

ভাষাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চারটি—

১। ভাষা শুনে বুঝতে পারা

২। প'ড়ে বোঝা

৩। বলতে পারা

৪। লিখতে পারা

এই চারটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ জীবনে কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। তাই উচ্চারণ যাতে শুদ্ধ এবং মার্জিত হয় ভাষা শেখা এবং শেখানোর ব্যাপারে সকলের আগে সেটা লক্ষ্য করতে হবে।

বাক্যে ব্যবহৃত অর্থবান্ ধ্বনিযুক্ত শব্দসমষ্টি হচ্ছে ভাষা। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব উচ্চারণ-রীতি আছে। বাংলা ভাষার উচ্চারণেও কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলা ভাষাব এই বিশেষত্বগুলি প্রকটিত হয়েছে বর্ণের উচ্চারণে, যুক্তবর্ণের উচ্চারণে, ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মগুলিতে, সন্ধিতে এবং স্বরাঘাতের বৈশিষ্ট্যে। এই নিয়মগুলি এক জায়গায় করেই বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্ব।

কলকাতা এবং কলকাতার কাছাকাছি ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ভাষার উপর ভিত্তি করে চলিত বাংলা গড়ে উঠেছে। তেমনি ঐ অঞ্চলের ভদ্রলোকদের উচ্চারণ-রীতিকেই আমরা চলিত বাংলার standard উচ্চারণ হিসাবে মেনে নিয়েছি। এই উচ্চারণ অনুসরণ করেই ছাত্রছাত্রীদের উচ্চারণ শেখাতে হবে।

ছাত্রছাত্রীকে শুদ্ধ উচ্চারণ শিখাতে হলে শিক্ষকের—তিনি বাংলাদেশের যে অঞ্চলের মানুষই হোক না কেন—ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সমাজে থাকতে হলে দশজনের সঙ্গে কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়। উচ্চারণ শুদ্ধ না হলে সমাজে হাস্যাস্পদ হতে হয় পদে পদে। দশজনের সামনে কিছু পড়তে হলেও শুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়োজন। কাব্য পাঠে তো সরব পাঠ অপরিহার্য। উচ্চারণতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষকের যথেষ্ট বোধ না থাকলে তিনি ছাত্রছাত্রীকে উপরি-উক্ত বিষয়ে সার্থক দীক্ষা দেবেন কি করে?

আরও অনেক কারণে শিক্ষকের ধ্বনিতত্ত্বে প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। ইস্কুলে বিভিন্ন পরিবার, সমাজের বিভিন্ন স্তর, এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছেলেমেয়েরা এসে সমবেত হয়। তারা নানারকমের বিকৃত উচ্চারণ নিয়ে আসে। কারও থাকে পারিবারিক উচ্চারণ দোষ, কারও আঞ্চলিক, কারও বা সমাজের বিশেষ কোন স্তরে প্রচলিত কোন উচ্চারণদোষ।

এর উপর আছে নানা উপভাষার দৌরাত্ম্য। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চারণ প্রচলিত। তার উপর স্বাধীনতার পর উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসীরা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হয়েছে। তাদের উচ্চারণবিকৃতি সংক্রামিত হচ্ছে অপরের মাঝে। দেশবিভাগ, চাকরি, ব্যবসা, প্রভৃতি নানা-কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও মানুষ একত্র হওয়ায় শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা-দান বিষয়টি প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নানাদিক থেকে নানাকারণে Staudaru বা স্বীকৃত উচ্চারণের উপর এই যে আক্রমণ একে প্রতিহত করবার, ভাবী নাগরিকদের এথেকে মুক্ত রাখবার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকের। তাই শিক্ষকের পক্ষে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অপরিহার্য।

নীচে ধ্বনিতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল।

১। **বর্ণের উচ্চারণ**—বাংলা সংস্কৃত থেকে বর্ণমালা পেয়েছে। উচ্চারণ বিষয়ে সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে বাংলা বর্ণমালার কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও বৈষম্যই বেশী। বাংলার লিপিমালায় স্বরবর্ণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ থাকলেও উচ্চারণে আমরা তা মেনে চলি না। ফলে ই, ঈ, উ, ঊ প্রভৃতির ধ্বনিমূল্য প্রায় একই। বাংলায় 'ঋ'-এর কোন নিজস্ব ধ্বনি নেই, এটি 'রি', হিসাবে উচ্চারিত হয়। 'অ'-এর ধ্বনি তিন রকম—বিবৃত যেমন 'হত') ; সম্বৃত (ে-এর মত, যেমন, 'করি' উচ্চারণে 'কোরি'), হসন্ত (যেমন মন, উচ্চারণে 'মোন্')। এসব উচ্চারণের নিয়মে অনেক খুঁটিনাটি থাকলেও মোটামুটি বলা যায়—ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, য-ফলা, ক্ষ, জ্ঞ—এদের পূর্বে 'অ' সম্বৃত তবে সেই 'অ' নিষেধার্থক 'অ' অথবা সহ অর্থে স এর অ হলে সম্বৃত হয় না। 'এ'-র উচ্চারণ দু'রকম—স্বাভাবিক ও বিকৃত। যেমন, একটি ; আবার এক (উচ্চারণে 'অ্যাক্')।

শব্দ মধ্যে নাসিক্য ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) থাকলে নিকটবর্তী স্বর সানুনাসিক হয়। যেমন, নাম>নাঁম। ণ, ন—এদের উচ্চারণে বাংলায় কোনও প্রভেদ নেই। বর্গীয় ব, অন্তঃস্থ ব,—এরা রূপ ও ধ্বনিতে এক। জ, য,—এরা উচ্চারণে জ ; শ, ষ, স—এদের সকলেরই উচ্চারণ শ।

ঃ—অনেকটা 'হ'-এর শিথিল ধ্বনি বা অঘোষ ধ্বনি। এর উচ্চারণ কয়েকটি অব্যয়ে পাওয়া যায়। যেমন—উঃ, আঃ ইত্যাদি। পদের শেষে ঃ (বিসর্গ) প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। যেমন—ক্রমশঃ, বিশেষতঃ ইত্যাদি। পদের মধ্যে থাকলে এর পরবর্তী বর্ণ প্রায়ই দ্বিত্বভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—দুঃখ (দুখ্‌খ), অতঃপর (অতপ্পর)।

২। যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ

সাধারণতঃ যুক্তাক্ষরের মূল বর্ণগুলির উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু কতগুলি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে।

(ক) ব-ফলা, ম-ফলা য-ফলা হ'লে যুক্তাক্ষরগুলি প্রায়ই দ্বিত্বভাবে উচ্চারিত হয়, কেবল ম-ফলার ক্ষেত্রে উচ্চারণে একটি লঘু অনুনাসিক ধ্বনি থাকে। যেমন—বিশ্ব (বিশ্‌শ); ঈশ্বর (ঈশ্‌শর); পদ্ম (পদ্‌দঁ); ভীষ্ম (ভীষ্‌ষঁ); সাম্য (সাম্‌ম); বাক্য (বাক্‌ক)।

কিন্তু প্রথম বর্ণে ব-ফলা বা ম-ফলা থাকলে তা প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। যেমন—জ্বর (জর); শ্মশান (শশান)।

(খ) ক্ষ (ক্‌ষ) বাংলা শব্দের প্রথমে থাকলে খ-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—ক্ষত (খত); ক্ষুর (খুর) প্রভৃতি। শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকলে ক্‌খ-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—অক্ষর (অক্‌খর); শিক্ষা (শিক্‌খা)।

(গ) জ্ঞ—এটির উচ্চারণ গ্যঁ-এর মত। যেমন—জ্ঞাতি (গ্যাঁতি), আজ্ঞা (আগ্যাঁ)।

(ঘ) হ্ম—এর উচ্চারণ মৃহ-এর মত। যেমন—ব্রহ্মা (ব্রম্‌হা)।

(ঙ) হ্য—উচ্চারণ জ্‌ঝ-এর মত। সহ্য (সজ্‌ঝ)।

(চ) হ্ল—উচ্চারণ ল্‌+হ-এর মত। যেমন—আহ্লাদ (আল্‌হাদ্)।

(ছ) হ্ব—জিহ্বা (জিউভা), আহ্বান (আওভান)।

৩। ধ্বনি-পরিবর্তন ঃ

স্বরভক্তি—উচ্চারণের সুবিধার জন্য স্বরধ্বনি দিয়ে সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে দেওয়ার নাম স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। যেমন—ভক্তি—ভকতি, বর্ষণ—বরিষণ, মুক্তা—মুকুতা, গ্রাম—গেরাম, শ্লোক—শোলোক।

স্বরসঙ্গতি—উচ্চ ও নিম্নস্বর বিশিষ্ট শব্দে উচ্চস্বরের প্রভাবে যদি নিম্নস্বর উপরে উঠে বা নিম্নস্বরের প্রভাবে উচ্চস্বর যদি নীচে নামে, তাহলে স্বরসঙ্গতি হয়।

উচ্চস্বরের প্রভাব ঃ উনান—উনুন, দেশী—দিশি, খুড়া—খুড়ো।

নিম্নস্বরের প্রভাব ঃ লিখা—লেখা, শুনা—শোনা।

অপিনিহিতি—শব্দ মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে উচ্চারণের সময় আগে থেকেই তা উচ্চারণ করে ফেলবার নিয়মকে অপিনিহিতি বলে।

ই-কারের অপিনিহিতি ঃ রাখিয়া—রাইখ্যা, রাতি—রাইত, সত্য—সইত্ত।

উ-কারের অপিনিহিতি ঃ গাছুয়া—গাউছা, মাছুয়া—মাউছা।

অপিনিহিতির এই 'উ' সাধারণতঃ 'ই'-তে পরিবর্তিত হয়।

অভিশ্রুতি—অপিনিহিত শব্দের 'ই' বা 'উ' পরবর্তী স্বরের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে মিলিত হয়ে 'এ' বা 'ও'-তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের নাম অভিশ্রুতি। যেমন, রাখিয়া—রাইখ্যা—রেখে, মাছুয়া—মাউছুয়া—মাইছুয়া—মেছো।

য়-শ্রুতি ও অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি—বাংলা শব্দে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলেও উচ্চারণ করার সময় কখনও কখনও সে দুটি স্বরের মধ্যে য়-ধ্বনি বা অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি এসে যায়। একেই য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি বলা হয়।

য়-শ্রুতি ঃ মা + এর—মায়ের ; লাঠি + আল—লাঠিয়াল।

ব-শ্রুতি ঃ খা + আ—খাবা—খাওয়া ; ছা + আ—ছাবা—ছাওয়া।

[অন্তঃস্থ 'ব' সন্ধ্যক্ষর অর্থাৎ উ + অ। জন্য এ-শ্রুতিটির প্রকাশ কোথাও 'ওয়', আবার কোথাও 'উয়' দিয়ে।]

বর্ণাগম—ইস্কুল, আস্পর্ধা (স্পর্ধা), বান্‌দর (বানর), অম্বল (অম্ল), সত্যি, পথ্যি ইত্যাদি।

বর্ণলোপ—নারকেল, অতিথ্, বড়দা (বড়দাদা), ইত্যাদি।

সমীকরণ—একই শব্দের মধ্যে বিভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনি পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ধ্বনি দুটিকে এক করে দেওয়া হয়। এর নাম সমীকরণ। যেমন, বিদ্দা (বিদ্যা), বিশ্‌শাস্ (বিশ্বাস), কত্তা (কর্তা), হাদ্দেখা (হাত দেখা) ইত্যাদি।

৪। সন্ধি—

উপরে ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা হল তা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সন্ধির (খাঁটি বাংলা এবং তৎসম সন্ধি) বহু সূত্রই এর মধ্যে আছে। ভাষায় সন্ধি একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে অস্বাভাবিক আমরা করে তুলি পড়ানোর দোষে। সন্ধি সম্পর্কে অল্প কথায় বলা যায় যে, সন্ধি হচ্ছে সমীকরণ আর নববর্ণীকরণ। নীচে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

নববর্ণীকরণ—

(১) অবর্ণ + ইবর্ণ, উবর্ণ, ঋবর্ণ = দ্বিতীয় স্বরের গুণ (মহেন্দ্র, মহোৎসব, মহর্ষি ইত্যাদি)।

[ই ঈ-এর গুণ 'এ', উ ঊ-এর গুণ 'ও' আর ঋ-এর গুণ 'অর্' ।]

(২) অবর্ণ + এ, = ঐ

অবর্ণ + ও, = ঔ

(৩) ইবর্ণ + অসবর্ণ = ইবর্ণ স্থানে য্ (অত্যন্ত, অত্যাচার, প্রত্যেক ইত্যাদি।)

(৪) এ + স্বরবর্ণ = অয়্ (নয়ন, শয়ন)

ঐ + স্বরবর্ণ = আয়্ (নায়ক, গায়ক)

ও + স্বরবর্ণ = অব্ (পবন, শ্রবণ)

ঔ + স্বরবর্ণ = আব্ (পাবক, নাবিক)

সমীকরণ—

অঘোষ + ঘোষ = ঘোষ + ঘোষ (দিগ্‌গজ, উদ্ভব)

ঘোষ + অঘোষ = অঘোষ + অঘোষ (তৎপর, তৎকাল)

ত বর্গ + চ বর্গ = চ বর্গ + চ বর্গ (সচ্চরিত্র, নাজ্জামাই)

ত বর্গ + ট বর্গ = ট বর্গ + ট বর্গ। উড্ডীন।

এ-ধরনের আরও অনেক উদারণ দেওয়া যেতে পারে।

৫। স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত—

এ ব্যাপারটাও ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্গত বলে ধরে নেওয়া দরকার। আমাদের

শ্বাসাঘাতের ব্যাপারটা ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা করলে এই রকম দাঁড়ায়।—ইংরেজী শব্দের আদিতে যে ঝোঁক বাক্যে যুক্ত হলেও তা বজায় থাকে, কেউ স্বাতন্ত্র্য হারায় না (অবশ্য preposition conjunction ছাড়া) ; কিন্তু বাংলা শব্দের একক উচ্চারণে আদিতে ঝোঁক থাকলেও, বাক্যে প্রযুক্ত সব শব্দে ঝোঁক থাকে না—বাক্যটি কয়েকটি অর্থপূর্ণ পর্বে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক পর্বের প্রথম শব্দের আদিতে ঝোঁক পড়ে। যেমন—

ˈবাংলা রচনায় বিদ্যাসাগরী ঢঙ্ | ˈএখনও কেউ কেউ | ˈপ্রয়োগ করেন।

বিকৃত উচ্চারণের সমস্যা

মাতৃভাষাতেই হোক বা অন্য কোন ভাষাতেই হোক, শুদ্ধ উচ্চারণ উপযুক্ত দীক্ষা ও প্রচেষ্টার দ্বারাই আয়ত্ত করতে হয়। শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানো শিক্ষকতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইস্কুলের বিভিন্ন পরিবার, সমাজের বিভিন্ন স্তর এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছেলেমেয়েরা এসে একত্র হয়। তারা নানা রকমের বিকৃত উচ্চারণ সঙ্গে নিয়ে আসে। কারো থাকে পারিবারিক উচ্চারণদোষ, কারো আঞ্চলিক, কাবো বা সমাজের বিশেষ কোন স্তরে প্রচলিত কোন উচ্চারণদোষ।

সাধু ভাষা উচ্চারণের ব্যাপারে এই বিকৃতির সমস্যা তত প্রকট নয়। কেননা, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু কবে ববীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কৃতিতে সুদীর্ঘকালের ব্যবধানেও অতি নগণ্য পরিবর্তনেব মধ্য দিয়ে সাধুভাষা আপন রূপটি বজায় রেখেছে। কিন্তু যেদিন থেকে কথ্যভাষা সাধুভাষার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন পেল. সেদিন থেকেই উচ্চাবণ-বিশুদ্ধির সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত। তার উপর স্বাধীনতার পর উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীবা পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী হয়েছে। ফলে শুদ্ধ উচ্চাবণ শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যিনি বাংলা পড়াবেন, তাঁকে সবরকম উচ্চারণ বিকৃতির খবর রাখতে হবে এবং শব্দের শিষ্ট ও স্বীকৃত রূপটির শুদ্ধ উচ্চারণ ছাত্রের মুখ থেকে আদায় করবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। এই সঙ্গে দেখতে হবে সে যেন শুদ্ধ রূপটির প্রয়োগ তার লেখাতেও করতে পারে। কারণ উচ্চারণ-বিকৃতি তো উচ্চারণ-বিকৃতিতেই সমাপ্তি পায় না, তা এসে শুদ্ধ বানানকেও আক্রমণ করে। এ-ত্রুটি প্রকট হয়ে ওঠে যখন ছাত্রছাত্রীরা চল্‌তি বাংলায় কিছু লিখতে বসে। মুখে 'বাশ' 'হাস' বলে বলেই তো লিখবার সময় চন্দ্রবিন্দু ভুলে যায়। তেমনি লাউ লিখতে নাউ, সম্মান লিখতে সন্মান এবং এরকম আরও কত ভুল করে থাকে।

নীচে বিভিন্ন উপভাষার প্রভাবে উচ্চারণে কি কি ধরণের বিকৃতি ঘটে তার একটা নির্ঘণ্ট দেওয়া হল ঃ

পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায়—

১। প্রথম স্বরধ্বনিতে শ্বাসাঘাত থাকায় পদান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ পায়। যেমন—দুধ>দুদ্, মধু>মদু।

২। কখনও কখনও অঘোষবর্ণের ঘোষবৎ উচ্চারণ হয়। যেমন—কাক>কাগ, শাক>শাগ।

আবার, মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণবৎ উচ্চারণও হয়। যেমন—মাঝখানে>মাজখানে।

৩। ভাগীরথীর পশ্চিমকূলের উপভাষাতে 'ল' স্থানে 'ন' ব্যবহার হয়। যেমন—লাউ>নাউ, লক্ষ্মী<নক্ষ্মী।

আবার 'র' লোপ পায় উচ্চারণের বেলায়। যেমন—আমি মচ্ছি নিজের জ্বালায়, তুমি কোচ্ছো ঠাট্টা।

৪। পশ্চিমবঙ্গের ম-এর জায়গায় ৺ব উচ্চারণ হয়। যেমন—আম>আঁব, নামাল>নাঁবাল।

আবার বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রিয়াপদে অনাবশ্যক অনুনাসিক আগম হয়।

৫। নদীয়ার শান্তিপুর অঞ্চলে 'ইএ' স্থলে 'এই'। যেমন—গিয়েছি>গেইছি।

পূর্ববঙ্গের উপভাষায়—

৬। চন্দ্রবিন্দুর লোপ। যথা—বাঁশ>বাশ, চাঁদ>চাদ।

৭। এ-স্থানে অ্যা। যেমন—বেত<ব্যাত।

৮। ড়-এর র-তে রূপান্তর। যেমন—বাড়ি>বারি।

৯। পদের আদি-স্থিত 'হ'-কারের লোপ এবং শ, ষ, স, প্রভৃতির হ-কারে পরিণতি। যথা—হয়>অয়, সে>হে, শালা>হালা।

১০। ছ স্থানে স-এর আগম। যেমন—করছি>করসি, করছিস>করসস্।

১১। ঋ-স্থানে ই-যুক্ত র-ফলা। যেমন, আবৃত্তি>আব্রিত্তি, বিকৃত>বিক্রিত, অমৃত>অম্রিত।

১২। যশোহর অঞ্চলে জ স্থানে z। যেমন—জানতে পার না > zান্তি পার না।

১৩। শ্রীহট্ট, মৈমনসিং প্রভৃতি অঞ্চলে ‘ও’-স্থানে ‘উ’ ‘উ’-স্থানে ‘ও’। যেমন—মূলা ক্ষেতে চোর>মোলা ক্ষেতে চুর।

এখন প্রশ্ন—কেমন করে শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাবো।

এজন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের আদর্শ উচ্চারণ। তিনি দেশের যে অঞ্চলের হোন না কেন, উচ্চারণে কোন আঞ্চলিক দোষ তিনি বয়ে আনবেন না ইস্কুলে। তিনি সমাজেব যে-স্তরের বা যে-ধরনের পবিবার থেকেই আসুন না কেন, তাঁর উচ্চারণ আদর্শ উচ্চারণ হওয়া চাই।

তাছাড়া, উচ্চারণ-বিকৃতির আবিষ্কার ও সংশোধনের জন্য ছাত্রদের মাঝে মাঝে সরব পাঠ করতে দেওযা উচিত। এই সরব পাঠে যখন উচ্চারণ-বিকৃতি ধবা পডবে, তখন একান্ত সহানুভূতি দিয়ে সে-বিকৃতি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। মূলকথা—শিক্ষকের উচ্চারণ যদি আদর্শ উচ্চারণ হয় আর তিনি যদি সহানুভূতি দিয়ে উচ্চারণ-বিকৃতি সংশোধন কবতে অগ্রসর হন, তাহলে কিভাবে তা করবেন, তাঁকে বলে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

মাতৃভাষা শেখা ও শেখানোর বিভিন্ন স্তর

মাতৃভাষা শেখা ও শেখানোর ব্যাপারে তিনটি স্তর বা পর্যায় ধরে নেওয়া যায়।

প্রথম পর্যায়—প্রাক্ পঠন-লিখন যুগ ঃ পুস্তকহীন অতিশৈশব।

দ্বিতীয় পর্যায়—পঠন-লিখন।

তৃতীয় পর্যায়—মৌলিক সৃষ্টি।

এই প্রথম পর্যায় হচ্ছে শিক্ষার্থীর অতি শৈশব। এ সময় ব'য়ের সাহায্য ছাড়াই শিশুর ভবিষ্যৎ লিখন-পঠনের প্রস্তুতি চলে। আগে আগে পাঁচ বছরের শিশুকে হাতে খড়ি দিয়ে প্রথম স্কুলে পাঠান হ'ত। তার আগে লেখাপড়ার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা ছিল না। আজকাল নানা ধরনের নার্সারি ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিশু তিন বছর বয়সেই এই সব ইস্কুলে ভর্তি হয়ে পরবর্তী জীবনের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। এসব স্কুলে শিশু পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে না। এ সময়ে সে কথা বলতে শেখে। তাই কথাবার্তা বলা, গল্প-বলা, ছড়া আবৃত্তি-করা, গান করা, অভিনয় করা—ইত্যাদির মাধ্যমেই শিক্ষা অগ্রসর হতে থাকে।

কথাবার্তা—পড়তে-লিখতে শেখার আগে কথাবার্তার ভেতর দিয়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। এই কথাবার্তার বিষয়বস্তুর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। শিশু শিক্ষকের সঙ্গে ঘরের কথা, খেলা বা খেলনার কথা, পোষা পাখি বা পশুর কথা—যা-ইচ্ছে বলতে পারে। তা-ছাড়া, শিশুকে নানা জিনিস বা জিনিসের মডেল দিতে হয়। সেগুলিকে স্পর্শ করে, নেড়েচেড়ে সেগুলির সম্বন্ধে সে স্পষ্ট ধারণা করবে। ঐ জিনিসগুলি সম্বন্ধে শিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তা হবে। কোনো বস্তু সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট না হলে, সে সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে কিছু বলার ক্ষমতা আসে না।

গল্প বলা—গল্প বলা কথাবার্তা বলার মতই। গল্প শুনতে ও বলতে শিশুর চিরদিনের আগ্রহ। এই বয়সে ওদের সবচেয়ে প্রিয় গল্প হল রূপকথা। কোন কোনো মনস্তত্ত্ববিদ্ শিক্ষক রূপকথা শোনানোর বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন, কিন্তু সে আপত্তি সবাই মেনে নেননি। রূপকথা ছাড়াও জাতকের গল্প, ঈশপের গল্প, হিতোপদেশের গল্প প্রভৃতি অবলম্বন করে শিক্ষকমশায় প্রথম প্রথম গল্প

শোনাবেন। এসব ব'য়ের গল্পে জীবজন্তু, গাছপালা, জিনিসপত্র প্রভৃতিকে চরিত্র হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। শিশু এসব গল্প শুনবে এবং পরে শিক্ষকের নির্দেশে সহপাঠীদের শোনাবে। অবশ্য যখন নিজে গল্প বলতে সুরু করবে, তখন প্রথম দিকটায় বাড়ির কথা অর্থাৎ মা-বাবা-ভাইবোনদের কথা, কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, পোষা পশুপাখির কথা, খেল্‌নার কথা—এসব অবলম্বন করেই সে গল্প বলবে।

গল্প শোনা ও গল্প বলার পাশাপাশি চলবে ছড়ার আবৃত্তি। গল্প বলার মত এতে মৌলিক সৃষ্টির সুযোগ না থাকলেও, এই আবৃত্তির দ্বারা শিশুর আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী আয়ত্ত হয়, তার কল্পনাশক্তি বিকশিত হয়। ছড়াগুলি শিশুদের মনে রোমান্টিক ভাবের সৃষ্টি করে। সবসময় ছড়ার অর্থ নাও থাকতে পারে। যেমন—

ডালিম গাছে পরভু নাচে
টাক্‌ডুমাডুম বাজনা বাজে ॥

পরভু কথাটা অর্থহীন হলেও তাদের আনন্দ কমবে না। তাছাড়া ছড়ার একটা মাদকতা আছে। ছড়াগুলি ছন্দেভরা, শিশুচিত্তে তারা আনন্দের দোলা দেয়।

গান—ছড়া ও কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে চলবে গান। জাতীয়-সঙ্গীত, প্রার্থনা-সঙ্গীত এবং অন্যান্য সহজ গান শিশুদের শেখাতে হবে। গানের মাধ্যমে শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বাড়বে, তার চিত্তে আনন্দ সঞ্চার হবে। তাই সহজ সহজ গান গাইতে শেখানো পঠন-লিখন-প্রস্তুতি যুগে অত্যন্ত মূল্যবান।

অভিনয়—এরপর শিশুদের অভিনয়ের কথা। গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি এবং অভিনয় এসব নিকট-সম্পর্কিত। গল্প বলা আর আবৃত্তির মত অভিনয়ও প্রথম থেকেই চলতে পারে। কোন গাথা, গল্প, নাটিকা ইত্যাদির অভিনয় করানো মাতৃভাষা চর্চার ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান। গল্প-গাথা ইত্যাদিতে শিশু যা প্রত্যক্ষ করেনি, অভিনয়ের মাধ্যমে তাই সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার শিশুরা অন্যকে অনুকরণ করে, কাজেই শিক্ষক-শিক্ষিকার ভাষা, তাঁদের উচ্চারণ এবং প্রকাশভঙ্গী বিশুদ্ধ ও মার্জিত হতেই হবে।

ছবি আঁকা—ছবি আঁকাও পুস্তকহীন প্রাক্‌-লিখন-পঠন স্তরে মাতৃভাষা চর্চায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশুরা যে-সব বস্তু নাড়াচাড়া করেছে, ছবি ও

ছড়ার ব'য়ে বা অন্যকোন ব'য়ে যে-সব ছবি দেখেছে, সেগুলি তারা সাধ্যমত নিজের নিজের খাতায় আঁকবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বোর্ডে এঁকে সেগুলি শেখালে সোনায় সোহাগা। এই যে কাঁচা হাতে আঁকবার দীক্ষা, এটা পরে বর্ণ-আঁকায় অর্থাৎ হাতের লেখা শেখার ব্যাপারে খুবই কাজে লাগবে।

পঠন-লিখন যুগ—এই মুখের পড়া আর ছবিআঁকা শেষ করেই পঠন-লিখন সুরু। শিশু প্রথম কি পড়বে,—কেমন করে পড়া শিখবে, কি লিখবে এবং কেমন করে লেখা শিখবে—এ আলোচনা 'পড়তে শেখানো' ও 'লেখা শেখানো' অধ্যায়ে করা হয়েছে। প্রাক্-পঠন-লিখন যুগে যেমন আনন্দ লাভই ছিল আসল কথা, পঠন-লিখন যুগের গোড়ার দিকেও এই আনন্দের উপভোগটাই বড় কথা। আনন্দের পথ ধরেই শিশু লেখা ও পড়ার মাধ্যমে এগিয়ে যাবে আত্মপ্রকাশের পথে, মৌলিক-সৃষ্টির পথে। তাই, পঠন-লিখন যুগের মাঝামাঝি সময়ে (পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীতে) তাকে পূর্ণতর সাহিত্য পড়তে (regular literature) হবে। এ সাহিত্য একদিকে যেমন তাকে শব্দের শুদ্ধ রূপ, শুদ্ধ ব্যবহার ইত্যাদির শিক্ষা দেবে, অন্যদিকে তেমনি তার অজ্ঞাতসারেই সৌন্দর্য ও আনন্দের সন্ধান দেবে, আত্মপ্রকাশের পথে তাকে এগিয়ে দেবে।

ইস্কুলে যে-কোন ক্লাসে সারা বছরে যেটুকু বাংলা পড়ানো হয় আর পড়ার শেষে পরীক্ষা নিয়ে পাশ-ফেলের ছাপ দেওয়া হয়, ছাত্রদের পক্ষে তা একান্ত সামান্য। মাতৃভাষার ওটুকু বাৎসরিক চর্চা নিয়ে কোনক্রমেই চলতে পারে না। এটুকু সম্বল নিয়ে সাহিত্যবোধ, সাহিত্য-রস সম্ভোগ—কিছুই হয় না এবং আত্মগঠন এবং আত্মপ্রকাশের শক্তিও অর্জন করা যায় না। এজন্য এই সময় শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষের পুস্তকাগার এবং ইস্কুলের পুস্তকাগার উপভোগ করবার জন্য ছাত্রের মনে যাতে সক্রিয় আগ্রহ জাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পাঠ্য হিসেবে যে সাহিত্য-পুস্তকখানা শিক্ষক ও ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হল, সেখানা guide বা পথ-নির্দেশক মাত্র। সেই পুস্তক বা সঙ্কলন পুস্তকখানা অবলম্বন করে শিক্ষকমশায় শিক্ষার্থীকে সাহিত্যের বিশাল আন্দোলনকে প্রবেশের অধিকার অর্জন করতে সহায়তা করবেন, প্রবেশ করিয়ে দেবেন। একটি গল্প দশটি গল্প পড়বার

আগ্রহ সৃষ্টি করবে—একটি কবিতা আরও দশটি কবিতার, একটি প্রবন্ধ আরও নানা প্রবন্ধের।

ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী (অর্থাৎ যেসব ভাষা মাতৃভাষা নয়) প্রভৃতি পড়বার সময় বাঙালী ছাত্রের লক্ষ্য হচ্ছে ভাষা শেখা। তাই সেখানে পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডি মেনে নিতে হয় শিক্ষককে, কিন্তু বাংলা পড়বার বা পড়াবার সময় ভাবতে হবে পাঠ্য পুস্তকটি সাহিত্যালোকের দ্বার স্বরূপ। মাতৃভাষার যে শিক্ষক সাহিত্য-পুস্তকটির গণ্ডি মেনে নেবেন, তিনি ছাত্রদের মাতৃভাষা চর্চা নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত ও ব্যর্থ করবেন।

এই পঠন-লিখন যুগে সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি চলবে ব্যাকরণ পাঠ ও নানাধরনের রচনা লেখা। 'কবিতা পড়ানো', ব্যাকরণ পডানো', 'রচনা শেখানো' প্রভৃতি অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

মৌলিক রচনা—মাতৃভাষা চর্চার দ্বিতীয় স্তরে যে পঠন-লিখনের আলোচনা হল, তা প্রস্তুতি রচনা করবে তৃতীয় স্তরের—মৌলিক রচনার—সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের। মাতৃভাষা চর্চার একটা বড় উদ্দেশ্য এবং শেষ উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে মৌলিক রচনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে দেওয়া। মৌলিক রচনা সৃষ্টির অঙ্কুর ছাত্রছাত্রীদের মাঝে থাকে, এবিষয়ে আগ্রহও তাদের থাকে। শিক্ষকের কাজ ঐ অঙ্কুরটিকে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া। এজন্য শিক্ষকের প্রচুর শ্রম ও চিন্তার দরকার। ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক রচনায় দীক্ষা দেবার আয়োজন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষকের নিজস্ব প্রস্তুতি এবং দ্বিতীয় প্রয়োজন ইস্কুলে অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুতি।

মাতৃভাষা চর্চার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর সৃজনমূলক কাজ নানারকমের হতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও একেবারে নীচের দিকের ক্লাসে প্রথমে শিশু ছাত্রছাত্রীরা গল্প বলবে, অভিনয় করবে, আবৃত্তি করবে, ছবি আঁকবে। কিন্তু তারপর দেখা যাবে কেউ হয়ত গল্প ভাল লিখতে পারে, কেউ কবিতা, কেউ প্রবন্ধ। আবার কেউ হয়ত ভাল বক্তা, কেউ বিতর্কে ভাল, কেউ বা ভাল অভিনেতা। আবার এমন অনেক ছাত্র থাকবে যারা নানা লেখা, নানা সংবাদ ইত্যাদি সাজিয়ে ইস্কুলের প্রাচীরপত্র বা পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহশীল ও নিপুণ। তাই ইস্কুলে শিক্ষককে উপরোক্ত সব ধরনের সৃজনমূলক

কাজের আয়োজন করতে হবে। অনুকূল পরিবেশ রচনা করতে হলে শিক্ষককে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাছাড়া, ছাত্রদের এ-ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতা দিতে হবে। ছাত্ররা প্রকৃত প্রস্তাবে অভিরুচি মত লিখবে, বক্তৃতা দেবে, অভিনয় করবে, আবৃত্তি করবে। শিক্ষক শুধু যথাপ্রয়োজন সাহায্য করবেন এবং উৎসাহ দেবেন। তিনি ইস্কুলে এমন পরিবেশ রচনা করবেন যাতে এইসব সৃজনমূলক কাজ করতে ছাত্রদের কোন সঙ্কোচ না হয়, 'নিরাপত্তা বোধের' কোন অভাব না ঘটে।

আর একটা কথা। ছাত্ররা কতটা লিখলো সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা—যা লিখেছে সেটা তার নিজস্ব রচনা কিনা। কেউ হয়ত দু'চার লাইন কবিতা লিখেছে, কেউ বা ছন্দ মিলিয়ে একটা ধাঁধাঁ, কেউ প্রবন্ধ, কেউ ভ্রমণকাহিনী। লেখাগুলো নিজস্ব হলে ভাষার ত্রুটি হলেও সানন্দে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে। ছাত্রদের ভুলচুক নিয়ে কোন কঠোর সমালোচনা করলে তারা চিরদিনের মত মৌলিক রচনার উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

ইস্কুলে প্রত্যেক ক্লাসের জন্য সপ্তাহে একদিন (ধরা যাক, শনিবারে শেষের দু'পিরিয়ড) এই ধরনের কাজের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। এই সময়ে কেউ হয়ত নিজের একটি লেখা পড়ল, কেউ হয়ত কোন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করল, কোনদিন একটা বিতর্কের আয়োজন করা হল—যাতে সবাই যোগ দিল। আর এইসব কাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে নিয়মিত প্রাচীর-পত্রিকা এবং বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা। এসব কাজের প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য নানা ব্যয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ মৌলিক কিছু লিখতে বা বলতে হলে পড়াশোনা ও জ্ঞানের একটা ভিত্ রচনা করতে হয়।

মাতৃভাষা চর্চা সম্পর্কে যেসব সৃজনমূলক কাজের কথা বলা হল, কারো কারো হয়ত তার কোনটাতেই আগ্রহ থাকবে না। কেউ হয়ত ছবি আঁকতে ভালবাসে, কেউ গান করতে, আবার কেউ বা অন্যকোন ধরনের হাতের কাজ। কেউ হয়ত এগুলোর কোনটাই পছন্দ করে না। এ অবস্থায় এদেরও টেনে এনে এইসব সৃজনমূলক কাজে লাগিয়ে দিতে হবে—একথা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়। তবে যে ইস্কুলে এসব সৃজনমূলক নানাকাজের সুযোগ আছে, এজন্য উৎসাহদানের ব্যবস্থা আছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের বেশ একটা আশাপ্রদ অংশ এসব কাজে সাধ্যমত লিপ্ত হবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আসল কথা, যে-ইস্কুলে শিক্ষার আনন্দধারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সবদিক-গুলি বিকাশের আয়োজন করে বয়ে চলেছে, সেখানে এধরনের চর্চা সহজেই স্বাভাবিক। অবশ্য এ-সব সৃজনমূলক চর্চার মানে এই নয় যে, ছাত্ররা সবাই পরে রবীন্দ্র, শরৎ, বিপিন পাল, শিশির ভাদুড়ী হয়ে উঠবে। অনেকেই তো সাধারণ গোছের থেকে যাবে। তবু যাদের এদিকে প্রতিভা আছে তারা ইস্কুলের আঙ্গিনায় সে প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ পেল, এর চেয়ে তৃপ্তির কথা আর কি হতে পারে!

অনুবাদের কথা

প্রথমেই বলা দরকার আমাদের আলোচনায় অনুবাদ বলতে ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদের কথাই বলা হচ্ছে। ভাষা থেকে ভাষান্তরে অনুবাদ কোন ভাষা-চর্চাব অপরিহার্য অঙ্গ নয়। এই হিসাবে বাংলাভাষার আয়ত্তী-কবণের ব্যাপারে ইংবেজী থেকে বাংলায় অনুবাদের কোন সম্পর্কই নেই। অবশ্য ছাত্রেব ইংরেজী কতটা শেখা হয়েছে জানবার জন্য মাতৃভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করতে বলাব মধ্যে অযৌক্তিক বিশেষ কিছু নেই। আসলকথা অনুবাদ করতে হলেই সংশ্লিষ্ট দুটি ভাষাতে সমান দক্ষতা থাকা দরকার।

ইংরেজ আমলে ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদের একটা বিশেষ মূল্য ছিল, তাই ঐ-অনুবাদকে বাংলাভাষার পঠন-পাঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদকে সে সময় বাংলাভাষা চর্চার একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হত।

ইংরেজ আমল চলে গেছে। অনুবাদ শেখা ও শেখানোর ব্যাপারে সে আমলে যে গুরুত্ব ছিল তা আজ নেই। তবু আজও অনুবাদ শেখার প্রয়োজন আছে। অনুবাদেব মাধ্যমেই ত আমবা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিব ভাবসম্পদ আমাদের ভাষার ভাণ্ডারে এনে জমা করতে পারি। বিদেশী সাহিত্যের রত্নরাজি অনুবাদের ভেতর দিয়ে আমাদের সাহিত্যে আমদানি করা যেতে পারে। তা ছাড়া, জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে অনুবাদ অপরিহার্য। দেশ-বিদেশের খবর ইংরেজী থেকে বাংলায় রূপান্তরিত করে সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হয়। এদিক দিয়ে অনুবাদের গুরুত্ব যথেষ্ট।

সম্প্রতি স্থির হয়েছে উচ্চতম শিক্ষাও মাতৃভাষার মাধ্যমে হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে বিভিন্ন বিষয়ের দুরূহ নানাগ্রন্থও মাতৃভাষায় অনুবাদ করে নিতে হবে। অনুবাদের গুরুত্ব এদিক দিয়েও প্রচণ্ড স্বীকৃতি পাবে।

ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ শেখানো সত্যই একটা সমস্যা। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজদের সমাজ ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, চিন্তাধারা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে। ইংরেজদের বাগ্‌বিধি তথা বচনারীতি বাংলাভাষা থেকে

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইংরেজীতে অসমাপিকা ক্রিয়ার পরিমাণ কম, বাংলায় বেশী ; ইংরেজীতে Possessive Pronoun (যেমন his, her, mine ইত্যাদি) ব্যবহার হামেশা হয়ে থাকে, কিন্তু বাংলায় এদের প্রতিশব্দ থাকলেও বহুল ব্যবহার নেই। তাছাড়া, The horse is a noble animal—ধরনের বাক্যের অনুবাদ করা তো সত্যিই মুশকিল। ইংরেজী idiom-গুলোকেও বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় বিপন্ন হতে হয়। To carry coal to Newcastle অথবা in the teeth of great difficulty—জাতীয় রাশি রাশি বাক্যাংশের উল্লেখ করা যেতে পারে যাদের বাংলায় অনুবাদ করা সত্যিই কঠিন। এজন্য অনেক সময় ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে শব্দের বা শব্দ সমষ্টির অর্থের দিকে নজর না দিয়ে শুধু ভাবের দিকে নজর দিতে হয়।

শুধু তাই নয়, ইংরেজীতে যা বলা আছে, বাংলায় বলতে গিয়ে তা সত্যিই বাংলাভাষা হল কি না সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে এটি প্রথম প্রয়োজন। যেমন, I don't care a straw for him—আমি তাকে থোড়াই পরোয়া করি এটাই হবে স্বাভাবিক অনুবাদ। কিন্তু প্রায়ই আমরা স্বাভাবিক অনুবাদ করতে পারি না। ধরুন বাংলাদেশের বহু কুকুর-বিলাসী সম্ভ্রান্ত বাড়িতে 'Beware of dogs' এবং তার বাংলা তর্জমা থাকে 'কুকুর হইতে সাবধান'! তেমনি Wait, till the bus stops—এর অনুবাদ 'বাস থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন'—সার্থক অনুবাদ হল না। কেমন যেন আড়ষ্ট বাংলা হল। বরং বলা দরকার, 'অপেক্ষা করুন, বাস থামতে দিন'। তেমনি আবার I am proud of my son আমি আমার পুত্রের জন্য গর্বিত —এ অনুবাদ স্বাভাবিক হল না। বরং বলা চলে আমি পুত্রগর্বে গর্বিত।

উপরে আলোচনা করা হ'ল ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হলে, অনুবাদের বাংলা যেন স্বাভাবিক বাংলা হয়। কিন্তু অনুবাদ সম্পর্কে আরও কিছু স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মূল রচনার মেজাজ বা বৈশিষ্ট্য (রস, সৌন্দর্য, রচনাশৈলী—এসব নিয়েই লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য) সার্থকভাবে সঞ্চারিত হওয়া চাই অনুবাদের মাধ্যমে। এটা অবশ্য দুরূহ ব্যাপার। এবং এ ব্যাপারে সার্থক হতে হলে অনুবাদকর্তাকে নেহাৎ অনুবাদক না হয়ে অনুবাদশিল্পী হতে হয়।

উপরে ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অনুবাদ চর্চা' গ্রন্থের ভূমিকায় ইংরেজী ও বাংলা শেখার ব্যাপারে অনুবাদ-প্রত্যনুবাদের পথ ধরে এগোলে দুটি ভাষাতেই অল্প সময়ে দখল জন্মানো সহজ হবে—এ কথা বলেছেন। অল্পকথায় ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ-প্রত্যনুবাদ-পদ্ধতিকে মূল্য দিচ্ছেন।

অনুবাদ-পদ্ধতির কয়েকটি উপযোগিতা আছে। কোন ভাষার শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বাক্য মাতৃভাষায় অনূদিত হলে শিক্ষার্থীর অর্থবোধ নিশ্চয়ই সহজ হয়। আবার অনুবাদের সময় একই অর্থের দুই ভাষার দুটি বাক্যকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করে উভয় ভাষার বাক্‌গঠনরীতি সম্বন্ধে বোধ জন্মে। প্রচুর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা নিয়ে উপযুক্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে এই অনুবাদ প্রত্যনুবাদ চালিয়ে গেলে দুটি ভাষাতেই অল্প সময়ে দখল জমানো সহজ হয়—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু **এ পদ্ধতি ভাষা শেখার পদ্ধতি নয়।**

ভাষাসম্পর্কে প্রথম কথাই হচ্ছে—Language is a spoken thing—ভাষা একটা মুখে বলবার জিনিস। অর্থাৎ কোন ভাষা শেখার রীতিই হচ্ছে সে ভাষায় কথা বলা অভ্যাস করা। মুখে বলে, ভাষা শেখা যত সহজ ও স্বাভাবিক হয়, অপর কোন পদ্ধতিতেই তা সম্ভব নয়। অনুবাদ-পদ্ধতিতে দুটি ভাষায় বাক্যগঠনের তুলনা-মূলক বিচার-বিশ্লেষণের কথা বলা হয়েছে। এ-তুলনা এ-বিশ্লেষণ শিশু শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, এপথে এগোতে গেলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষণীয় ভাষার প্রতি বিরাগ জাগা স্বাভাবিক। কারণ, এ অতি ক্লান্তিকর পদ্ধতি, এ পথে প্রচুর মেহনতে যে দক্ষতা আসবে, সে-দক্ষতা ভিন্নপথে অল্প শ্রমে সম্ভব।

অনুবাদ-পদ্ধতি সম্পর্কে শেষ অসুবিধার কথা হচ্ছে—প্রত্যেক ভাষাতেই এমন অনেক শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা বাক্য থাকবে যার সঠিক অনুবাদ অপর ভাষায় সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে এ-কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। তাই অনুবাদ-পদ্ধতি বয়স্কদের পক্ষে তথা উভয় ফাষায় যাদের কিছুটা দক্ষতা আছে তাদের পক্ষে কিছুটা উপযোগী হলেও, ভাষা শিক্ষার একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হিসেবে একে স্বীকৃতি দেওয়া চলে না।

এবার আলোচনা করা দরকার ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ যদি শেখাতেই হয়, তবে কখন শেখাতে হবে এবং কিভাবে শেখাতে হবে। প্রথম কথা ছাত্রের ইংরেজী পাঠ যখন বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে, সেই সময়েই

অনুবাদ শেখানো সুরু করতে হয়। বলা বাহুল্য ছাত্রের ইংরেজী ভাষা-জ্ঞানের পরিধির ভেতরই অনুবাদকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এ কাজ নবম শ্রেণীতে সুরু করাই যুক্তিযুক্ত। গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি থেকে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ প্রথমে অনুবাদ করাতে হবে। উঁচু ক্লাসে সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে লেখারও অল্পবিস্তর অনুবাদ চর্চা করতে হবে। অনুবাদ শেখানোর সময় ছাত্রদের দেখিয়ে দিতে হবে কোথায় কেবল আক্ষরিক অনুবাদই যথেষ্ট, কোথায় শব্দার্থ ছেড়ে ভাবার্থে যেতে হবে, কোথায়ই বা শব্দ ও ভাবকে অতিক্রম করে রসানুবাদ করতে হবে।

শ্রেণীকক্ষে অনুবাদ শেখানোর সময় প্রথম সোপানে অনুবাদের বিষয়টি কেন্দ্র করে কয়েকটি প্রশ্ন করে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে নিতে হবে। তারপরই অনুবাদের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে একটি ছোট ভূমিকা।

দ্বিতীয় সোপানে শিক্ষকমশায় অনুবাদের অংশটি ধীরে ধীরে সরবে পড়বেন এবং খাঁটি ইংরেজী বাগ্‌ভঙ্গী বা দুরূহ শব্দ থাকলে কিভাবে অনুবাদ করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেবেন বা সেগুলির অনুবাদ বোর্ডে লিখে দেবেন।

তৃতীয় সোপানে ছাত্ররা বিষয়টির অনুবাদ করবে। এইভাবে অগ্রসর হলে অনুবাদের পদ্ধতি অনেকটা সুষ্ঠুভাবে শেখানো যেতে পারে। ছাত্রদের মাঝে মাঝে আদর্শ অনুবাদের অংশবিশেষ পড়ে শোনানো ভাল। যেমন, জওহরলালের 'Discovery of India', 'Glimples of World History' প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ; আবার রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'র ইংরেজী অনুবাদ, 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) গ্রন্থের কে. সি. সেন-কৃত বা 'আনন্দমঠ' গ্রন্থের অরবিন্দ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ ইত্যাদি।

ছন্দ ও অলংকারের কথা

॥ ছন্দ ॥

ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ে, যেখানে আদি কবি বাল্মীকি বলছেন—

"মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।"

সত্যি কথা। মানুষের প্রত্যহের সাধারণ ভাষায় কবি যখন ছন্দোযোগ করে কবিতা লেখেন, তখন ভাষা তার অর্থের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে যায়। কবির ছন্দ ভাষায় যুক্ত হয়ে ভাষাকে এক অনবদ্য সুষমায় মণ্ডিত করে তোলে, ভাষায় গতি ও শ্রী সঞ্চার করে। এসব কথা বলে' ছন্দ সম্বন্ধে অনেকটা বলা হলেও, অনেকটাই না-বলা রয়ে গেল। ছন্দ ভাষায় এক অনির্বচনীয় আনন্দের দোলা, আর গীতির স্পর্শ এনে দেয়। এই আনন্দের দোলা, এই গীতিমাধুর্য কি, তা কাব্যরসিক হৃদয়ে অনুভব করেন, ভাষায় গুছিয়ে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। এই কারণেই ছন্দের জন্য শিশুদের আগ্রহের সীমা নেই। অর্থ অর্থ করে অনর্থ সৃষ্টি করা পণ্ডিতের স্বভাব হতে পারে, শিশুর নয়। শিশু চায় ছন্দের দোলা—ছন্দের যাদু। এর কারণ ছন্দের দোলা আনন্দের দোলা, ছন্দের যাদু, আনন্দের যাদু। এদেশের ছড়া, ওদেশের nursery rhymes—শিশুচিত্তকে মুগ্ধ ও আনন্দিত করে এসেছে ছন্দের দোলা দিয়ে, ছন্দের অন্তর্নিহিত গীতিমাধুর্য দিয়ে—অর্থ দিয়ে নয়।

বড়দের বেলাতেও তাই। আমরা যখন কবিতা পড়াই তখন কবির সমস্ত আবেগ ও অনুভূতি ছাত্র-মনে সঞ্চার করে দেবার দায়িত্ব আসে। কবিতাটির শব্দার্থ মর্মার্থ দিয়ে কবিতার দেউড়িতে পৌঁছন যায়, অন্দর মহলে—কবিতার আনন্দলোকে পৌঁছন যায় না। তাই একমাত্র রসসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমেই এই রসসঞ্চার সম্পন্ন হতে পারে। এই সার্থক পাঠের মাধ্যমেই কবিতাটি লিখবার সময় কবির হৃদয়ে যে আবেগের লীলা চলেছিল, সেই আবেগের আবির্ভাব ঘটানো যায় ছাত্র হৃদয়ে।

কবিতার রসসঞ্চারী পাঠ তাই কবিতার সার্থক পাঠনের ব্যাপারে অপরিহার্য। এই সার্থক রসসঞ্চারী পাঠের জন্যই শিক্ষকের ছন্দ জ্ঞানের প্রয়োজন। ছন্দবোধ ভালরকম না থাকলে কবিতা ভাল করে পড়াই সম্ভব হয় না। হৃদয় দিয়ে, ছন্দ রক্ষা করে পাঠ করতে না পারলে কবির অনুভূতি ছাত্র হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় না, কবিতা পাঠের আনন্দেও তাদের হৃদয় নন্দিত করা হয় না। শুধু তাই নয়, অর্থবোধও মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হতে পারে। শিক্ষকের ছন্দোবোধের অভাবে যদি পড়তে পড়তে তাঁর ছন্দ কেটে যায়, ছন্দের মায়াজালে ছাত্র-মন যদি বাঁধা না পড়ে, তবে কবিতা পাঠে ছাত্রদের মনঃসংযোগই হয়ত হবে না, হৃদয়-সংযোগ তো দূরের কথা। তাই শিক্ষককে ছন্দোবিজ্ঞানের মূল কথাগুলি জানতে হবে। বাংলায় কতো বিচিত্র ছন্দ, কতো বিচিত্র তাদের সুর, সৌন্দর্য ও আনন্দ—এসব খবর শিক্ষককে রাখতে হবে। মাতৃভাষার শিক্ষকের ছন্দজ্ঞান ছাত্রকে ছন্দোবিজ্ঞান শেখানোর জন্য নয়, তাঁব কবিতাপাঠন সার্থক ও আনন্দময় করে তোলবার জন্য।

॥ অলংকার ॥

মানুষ যেদিন প্রথম একটি ফুল তুলে প্রিয়ার খোঁপায় পরিয়ে দিয়েছে অথবা বিনা প্রয়োজনে মাটির পাত্রে, ঘরের দেয়ালে বা পাহাড়ের গায়ে নক্‌সা কাটতে সুরু করেছে—সেদিন থেকেই অলংকারের আবির্ভাব। ঈশ্বর বিশ্বকে সালংকার করে রেখেছেন, মানুষও তার সবকিছুকে অলংকৃত করতে চেয়েছে। তাই তার ভাবের বাহন ভাষায়, তার কাব্য-কবিতাতে অলংকারের আমদানি। অবশ্য নারীর ভূষণ বা পাহাড়ের গায়ে নক্‌সা নারীর বা পাহাড়ের বাইরের জিনিষ। কাব্যের অলংকার এ-রকম বাইরের জিনিষ নয়। কাব্যের অলংকার কাব্যের অঙ্গীভূত সুষমা, কাব্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। অলংকার কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। আলংকারিকরা বলেন, কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য 'রস' যার আত্মা। এই রসলোকে পৌঁছবার একটি প্রধান সোপান হচ্ছে অলংকার। মনের ভাবকে রসিয়ে তুলতে অলংকার-প্রয়োগ কবিকে প্রচুর সাহায্য করে। রস-সৃষ্টির একটি প্রধান কৌশলই হচ্ছে অলংকার। অবশ্য কাব্য-রস-সৃষ্টি অনেক কিছু দিয়েই করা যায়, অলংকার সেই অনেক কিছু

কৌশলের মধ্যে একটি কৌশল। অলংকার তখনই সার্থক, তখনই রসসৃষ্টির সহায়ক, যখন তা কবির অন্তর থেকে স্বতউৎসারিত। যিনি যেমন শ্রেণীর কবি, তাঁর অলংকার-প্রয়োগ-কৌশলও তেমনি। আবার বড় কবিরা অনেক ক্ষেত্রে অলংকার বাদ দিয়ে বাক্যকে রসাত্মক করেছেন—এরও অনেক উদাহরণ আছে।

অলংকার দু'রকম। শব্দের ধ্বনি-রূপের আশ্রয়ে যে-সব অলংকার সৃষ্টি হয়, সেগুলি শব্দালংকার। শব্দের ধ্বনিরূপ পরিবর্তন করে দিলে শব্দালংকার ঠিক থাকে না। আবার, শব্দের অর্থ অবলম্বন করে যে অলংকার সৃষ্টি হয়, সেগুলি অর্থালংকার। শব্দেব ধ্বনিরূপ পরিবর্তন করলেও, অর্থালংকার ক্ষুণ্ণ হয় না। যেমন—

'পদ্মের কলিকা সম ক্ষুদ্রতব মুষ্টিখানি'—কবির শব্দগুলিব পরিবর্তন করে যদি বলি—

কমল কোরক সম ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি,—তাহলেও উপমা অলংকার ব্যাহত হয় না।

কিছুকাল হল কতগুলি অলংকার মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য হয়েছে। অলংকার মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য করা সমীচীন কিনা, এ-নিয়ে মতভেদ আছে। এ-সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক বহু প্রখ্যাত সাহিত্য স্রষ্টার রচনায় সমৃদ্ধ। এ-সব রচনার সাহিত্যগুণ অনস্বীকার্য। এ-সব রচনায়, তা গদ্যই হোক বা পদ্যই হোক, স্বভাবতই অলংকারের অভাব নেই। তাই রচনাগুলি উপভোগ করতে হলে ছাত্রছাত্রীদের অলংকারবোধ অবশ্যই প্রয়োজন। সাহিত্য পঠন-পাঠনের সময় প্রত্যেক অলংকারের ক্ষেত্রেই যদি শিক্ষককে অলংকারটি বিশ্লেষণ করতে হয়, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে হয়, তার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সাহিত্যরস উপভোগে বিঘ্ন ঘটে। তাই কয়েকটি প্রধান প্রধান অলংকারের স্বরূপ এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে ছাত্রদের বোধ যদি পৃথক্‌ভাবে ঘটিয়া দেওয়া যায়, তাহলে পাঠ্য সাহিত্যের রসভোগ সহজ ও অবিঘ্নিত হয়; কারণ, সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে বিশ্লেষণের রসহীন পথে না এগিয়ে প্রয়োজনবোধে অলংকারটির ইঙ্গিত দিলেই যথেষ্ট হয়।

এজন্যই মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাহিত্য পাঠের অঙ্গ হিসাবে প্রধান প্রধান কয়েকটি অলংকার পাঠ্য করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

মূল্যায়ন

মাতৃভাষাকে বলা হয়েছে an inescapable circumstance of life—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্বের সংগে তার মাতৃভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। এই মাতৃভাষা পঠন-পাঠনের অতি-প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল শুনে ও পড়ে বোঝা এবং বলে ও লিখে অপরকে বোঝান। এর পরবর্তী পর্যায়ে উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা ব্যবহারে প্রকৃত দক্ষতা অর্জন, সাহিত্য পাঠ এবং সাহিত্য-রস উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি। এই লক্ষ্যের শেষ পর্যায়ে আছে মাতৃভাষায় মৌলিক রচনা, সাহিত্য-সৃষ্টি, গবেষণা প্রভৃতির ক্ষমতা অর্জন।

উপরের এইসব উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হল জানবার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যে পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত তাকে বলা হয় রচনামূলক পরীক্ষা (essay-type examination)। রচনামূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধে শিক্ষাবিদ্ মহলে অভিযোগের অন্ত নেই। তাঁরা বলেন—

(১) এ-ধরনের পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর রচনা-ক্ষমতার উপর অবাঞ্ছিত গুরুত্ব পরীক্ষকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আরোপ করা হয়ে থাকে,

(২) এ-ধরনের পরীক্ষায় মুখস্থ করার প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়, ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব রচনা-ক্ষমতার চর্চা অবহেলিত হয়,

(৩) সর্বোপরি পরীক্ষকের ভালো লাগা বা ভালো না-লাগা সঠিক মূল্যায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

প্রথমেই দ্বিতীয় অভিযোগটির আলোচনা করা যাক। ছাত্রদের কোনো পরীক্ষার কতগুলি উত্তরপত্র নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, উত্তর পত্রে নানা জাতের লেখা আছে। দুটি ব্যাখ্যা হয়তো ছাত্রের মুখস্থ থেকে পড়েছে, সেখানে লেখা চমৎকার হয়েছে ; কিন্তু তৃতীয়টির অর্থাৎ যেটি সে নিজে লিখেছে ভাষা, রচনাশৈলী সবই খুব কাঁচা। আবার হয়তো সমস্ত উত্তরগুলি অত্যন্ত কাঁচা, কিন্তু প্রবন্ধটি দস্তুর মত সাহিত্য হয়ে উঠেছে অর্থাৎ প্রবন্ধটি কোনো ভালো রচনা পুস্তক থেকে ছাত্র মুখস্থ করেছে। এ-সব ক্ষেত্রে নম্বর দিতে গিয়ে আসলে আমরা নম্বর দিই সাহিত্য পুস্তকের বোধিনী-

রচয়িতাকে, প্রবন্ধ পুস্তক প্রণেতাকে এবং মাঝে মাঝে ছাত্রকে। পরীক্ষকের পক্ষে এ উৎপাত এড়ানো একরকম অসম্ভব।

রচনাভিত্তিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ হচ্ছে পরীক্ষকের ভালো-লাগা মন্দলাগার উপর নম্বর পাওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে। এমন কি, একই উত্তরের জন্য একই শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দিতে পারেন।

'An Examination of Examinations' বইটিতে সংশয়াতীতভাবে দেখানো হয়েছে যে, পরীক্ষকের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ এ-ধরনের পরীক্ষায় ছাত্রের বিদ্যাপরিমাপের বিষয়টা কিভাবে পণ্ড করে দেয়।

পরীক্ষা ব্যাপারটাকে যখন একেবারে রহিত করবার উপায় নেই, তখন একে এমনভাবে সংস্কার করা প্রয়োজন যাতে পরীক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ করা যায় এবং পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রভৃতিতে কোথায় ত্রুটি আছে এবং কোন পথে সে-ত্রুটির নিরসন সম্ভব তা জানতে পারা যায়। এই ধরনের চিন্তা থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন ব্যাপারটির আমদানি হয়েছে। মূল্যায়ন কথাটির অর্থ খুব ব্যাপক। পরীক্ষা (examination) অথবা পরিমাপ (measurement)-এর থেকে মূল্যায়নের ব্যাপকতা ঢের বেশী। অল্প কথায় মূল্যায়ন হচ্ছে ছাত্রের অর্জিত বিদ্যার সঠিক পরিমাপ ও তৎসহ নির্দেশন (measurement plus guidance)।

কিসের নির্দেশন, কোন্ ব্যাপারে guidance?—বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক্। মূল্যায়ন একটা একক ব্যাপার নয়। শিক্ষা-প্রক্রিয়া (the process of education) বলতে যে তিনটি পরস্পর-সম্পৃক্ত বিষয় বুঝায়, মূল্যায়ন তারই একটি। এই তিনটি পরস্পর-সম্পৃক্ত বিষয় হচ্ছে—

(১) শিক্ষার লক্ষ্য

(২) ছাত্রকে সেই লক্ষ্যে নিয়ে যাবার জন্য নানা আয়োজন ও প্রক্রিয়া (যেমন, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, পাঠনপদ্ধতি ইত্যাদি) যার দ্বারা রচিত হয় ছাত্রের শিক্ষাসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা (learning experiences)

(৩) মূল্যায়ন

উপরি-উক্ত তিনটি বিষয় এমনভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত যে এদের কোন একটিকে পৃথক করে স্বাধীনভাবে ভাবা যায় না।

মূল্যায়নকে বলা হয়েছে পরিমাপ ও নির্দেশন। কারণ মূল্যায়নের দ্বারা আমরা জানতে পারি ছাত্র শিক্ষার লক্ষ্যে কতটা পৌঁচেছে, জানতে পারি,

পাঠ্যসূচী পাঠন-প্রক্রিয়া প্রভৃতিতে কোথাও ত্রুটি আছে কিনা। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার ফল এ-দু'য়ের মাঝখানে যদি ফাঁক বা ত্রুটি থাকে তবে মূল্যায়ন আমাদের সেই ত্রুটি নির্ধারণ করতে এবং তার নিরসন করতে পথনির্দেশ করে।

মূল্যায়ন সম্পর্কে উপরি-উক্ত আলোচনার পর অতি সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, বাংলা পঠন-পাঠনের মূল্যায়নের কথা ভাবতে হলে তিনটি বিষয় একসঙ্গে ভাবতে হবে ঃ

(১) বাংলা (মাতৃভাষা) পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য

(২) সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ছাত্রকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যে অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়েছে তার কথা (learning experience)

(৩) মূল্যায়ন,—যার দ্বারা জানা যাবে উপরি-উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় কতটা সার্থক হয়েছে এবং ওগুলির কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কিনা।

উপরি-উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এবার মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন বচনাসম্পর্কে আলোচনা করা যাক্। মূল্যায়নের জন্য আমরা যে-সব প্রশ্ন রচনা করি তাদের বলা হয় মূল্যায়নের হাতিয়ার (tools of evaluation). মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রচনা করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে—

(১) প্রশ্নগুলির যেন বিশ্বস্ততা এবং সার্থকতা থাকে (reliability and validity)।

(২) প্রশ্নরচনা এবং ছাত্রেব উত্তরগুলিতে নম্বর দেওয়া যেন স্বল্পায়াসসাধ্য হয় (the ease of administering and scoring the tests)

(৩) শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়গুলির চর্চার যতগুলি দিক বা ক্ষেত্র আছে, তার সবচেয়ে বেশী সংখ্যক দিকে অর্জিত বিদ্যার যেন পরিমাপ হয়। (possibility of using a wider sample of learning experiences to which the pupils are exposed). এ-সব কথা মনে রেখে প্রশ্ন-রচনার কথা ভাবলে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কথাই মনে হয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং সে উত্তরে নম্বর দেওয়া—এই দুই ব্যাপারে ছাত্র ও শিক্ষকের ব্যক্তিক দিকটা কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না, মুখস্থ বিদ্যা লিখে ছাত্র শিক্ষকের কাছে তার আসল বিদ্যা গোপন করতে পারে না, কোন প্রশ্ন অবলম্বন করে আজে-বাজে লিখবার (writing around the question) অবকাশও থাকে না। স্বল্পায়াসেই শিক্ষক ছাত্রের বিদ্যার পরিমাপ করতে পারেন এবং

ছাত্রও তার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু এজাতের পরীক্ষার সব চেয়ে বড় ত্রুটির দিক হচ্ছে ছাত্রের চিন্তাশক্তির খবর এ-পরীক্ষায় আমরা পাই না, তার রচনাশৈলীর হদিশ এ-পরীক্ষা দেয় না। অথচ, মাতৃভাষার মূল্যায়নে এগুলির পরিমাপ বিশেষ মূল্যবান্।

নেহাত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ছাড়াও, মূল্যায়নের জন্য এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে যার উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত (Short-answer type tests). প্রশ্নের উত্তর যত ছোট হবে ততই শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর যথাযথ অনুসরণ করতে হবে, আজে-বাজে ভাববার বা লিখবার অবকাশ সঙ্কীর্ণ হবে। মাতৃভাষার পাঠে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা দরকার। এ-মূল্যায়নের ক্ষেত্র থেকে রচনামূলক পরীক্ষাকে আমরা একেবারে নির্বাসিত করতে পারি না। রচনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি ছাত্রের চিন্তাশক্তির খবর, আত্মপ্রকাশের শক্তি, তার রচনাশৈলীর উৎকর্ষ ইত্যাদি।

নীচে কয়েকটি অতি পরিচিত পাঠ্যবস্তু অবলম্বন করে মাতৃভাষার পাঠে মূল্যায়ন উদ্দেশ্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন রচনার কয়েকটি আদর্শ দেওয়া হল। কোনো ক্ষেত্রেই কোনো পাঠ্যবস্তুর সম্পূর্ণ প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়নি। এই পুস্তকে **বহুরূপী গল্পের পাঠ-পরিলেখ** অংশে কিছু ছোট-উত্তরের প্রশ্ন (Short-answer type questions) এবং কিছু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

Multiple choice type—(বহুর মধ্যে একটিকে বাছাই)

উদ্দেশ্য—পাঠের সঠিক অনুধাবন ও মর্ম গ্রহণের পরীক্ষা

(শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা—দশম শ্রেণী)

১। বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণের জন্য বন্ধনীভুক্ত শব্দগুলির মধ্যে উপযুক্তটির পাশে ✓ চিহ্ন বসাও ঃ

(দশম শ্রেণী—শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা)

(ক) শকুন্তলা কহিলেন,···সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। (সখীদের, হরিণ শিশুকে, বনতোষিণীকে, গুরুজনদের)

(খ) অতঃপর···তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(প্রিয়ংবদা, পিতা, শারদ্বত)

(অষ্টম শ্রেণী—বঙ্গে শরৎ)

২। সঠিক উত্তরের ডানদিকে √ চিহ্ন দাও

কবি বলছেন, 'আয় আয় আয়, আজ যে যথায়', কারণ—

(ক) বাংলাব শাবদ শোভা দর্শনীয়

(খ) বাংলার শরৎকালীন আনন্দ-উৎসবে সবার যোগ দেওয়া উচিত

(গ) বঙ্গ জননী ভাণ্ডাব উন্মুক্ত করে সবাইকে অন্ন বিতরণ কবছেন।

Matching Type (ঠিক ঠিক জোড়া দেওয়া)

উদ্দেশ্য—চিন্তা-শক্তি ও প্রয়োগ ক্ষমতা পরীক্ষা।

১। বাঁ পাশেব স্তম্ভে ক্রমিক নম্বব দিয়ে কতগুলি শব্দ সাজানো আছে। ডান পাশের শব্দগুলির সঙ্গে বাঁ পাশেব যে-যে নম্বরেব শব্দগুলি মিল খায়, ডান পাশের শব্দগুলিব পাশে সেই সেই নম্বর লেখ ঃ

(১) হরিণগণ	নিবানন্দ ও শোকাকুল।
(২) ময়ূর ময়ূরী	আহার বিহারে পরাঙ্মুখ।
(৩) জীব মাত্র	নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বমুখ হইয়া রহিয়াছে।
(৪) কোকিলগণ	মধুপানে বিরত।
(৫) মধুকর মধুকরী	আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ।

২। বাঁ দিকে দুটি চরিত্রের নাম এবং ডান দিকে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে কত-গুলি দোষগুণের নাম দেওয়া আছে। যেটি যে-চরিত্রের পক্ষে প্রযোজ্য, সেই চরিত্রের নামের পাশে ঐ-সব দোষগুণগুলির ক্রমিক সংখ্যা বসাও।

ইন্দ্রনাথ	(১) মহত্ত্ব (২) ভীরুতা (৩) স্বার্থপরতা
নতুনদা	(৪) সাহসিকতা (৫) অহংকার
	(৬) উদারতা

উদ্দেশ্য—স্মৃতিশক্তি এবং পাঠগুলির মর্মগ্রহণ এবং ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে পরীক্ষা।

১। শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) জ্ঞানের নিধান, আদি বিদ্বান,—সাংখ্যকার,

(খ) বাঙালী—লংঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,

(গ) জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী—,

(ঘ) বাংলার রবি—কবি কান্ত কোমল পদে

('আমরা'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

২। যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, কদাচ তোমাদের করিতেন না; তোমাদের ·সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহাব সীমা থাকিত না, অদ্য সেই ·· পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমবা সকলে কব। (শকুন্তলাব পতিগৃহে যাত্রা)

পরিশিষ্ট

॥ পাঠটীকা ॥

মাইকেল মধুসূদন

(যোগীন্দ্রনাথ বসু)

নিজের উচ্চাভিলাষ ও আন্তরিক বিদ্যানুরাগগুণেই মধুসূদন বাংলাদেশের একজন অগ্রগণ্য বিদ্বান হইয়াছিলেন। কি পঠদ্দশায়, কি শিক্ষকতা কার্যের সময়, কি ব্যারিষ্টার অবস্থায়, কখনো মধুসূদন বিদ্যোপার্জন সম্পর্কে অযত্ন প্রকাশ করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় হিন্দু কলেজে থাকিতে তিনি যেমন যত্ন সহকারে গ্রন্থাভ্যাস করিতেন, মাদ্রাজে শিক্ষকতা কার্য করিবার সময়েও ঠিক তেমনিই করিতেন। মাদ্রাজে থাকিতে তেলেগু, তামিল, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষা এবং ফ্রান্সে থাকিড়ে ফ্রেঞ্চ্ জার্মান ও ইতালীয়ান ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি দেহমন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তাকালয় এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যখনই যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন তখনিই সেখান হইতে গ্রন্থরাশি আনাইয়া নিজেব জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

রোগ, দরিদ্রতা, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি যে সকল বিঘ্ন মানুষের জ্ঞান পিপাসা বিশুষ্ক করিয়া দেয়, মধুসূদনের জীবনে তাহার কোনোটিরই অভাব ছিল না; কিন্তু নিত্য প্রবহণশীল উৎসের ন্যায় তাঁহার জ্ঞানার্জনস্পৃহা সংসারের কঠোর নিদাঘ তাপের মধ্যেও তাঁহার হৃদয় হইতে নিরন্তর নিঃসৃত হইত।

সংসার যন্ত্রণায় নিপীড়িত হৃদয় যে বাগ্দেবীর কর-পদ্ম-স্পর্শে সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে পারে, মধুসূদন আত্মজীবনীতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্কর্ষ তাঁহার কাব্যানুরক্তি। নানা দেশীয় কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ কোনো ব্যক্তি বোধ হয় এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনে অন্যান্য অনেক গুণের ন্যায় এই কাব্যানুরাগও তাঁহার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্ধিত

হইয়াছিল। সে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবী দেবী তৎকালেও লেখাপড়া করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাংলা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন আট-দশ বৎসর বয়সের সময়ে মাতাকে ও বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ কবিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন।

—0—

পাঠটীকা—১

তারিখ

শ্রেণী—সপ্তম বিষয়—বাংলা গদ্য

ছাত্র সংখ্যা— অদ্যকার পাঠ—

গড় বয়স— —'মাইকেল মধুসূদন' (প্রবন্ধ)

সময়— যোগীন্দ্রনাথ বসু

শিক্ষক—

উদ্দেশ্য—(ক) প্রবন্ধটির অর্থ, রসমাধুর্য ও রচনাশিল্প অনুধাবন করতে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(খ) কাব্যানুরাগ মধুসূদনকে কিভাবে বিভিন্ন ভাষাশিক্ষায়, বিভিন্ন ভাষার কাব্য সাহিত্য অধ্যয়নে এবং কাব্য প্রভৃতি রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল ছাত্রদের তা জানতে সহায়তা করা।

উপকরণ ঃ

আয়োজন—ছাত্রদের মন পাঠাভিমুখী করবার জন্য শিক্ষকমশহায় নিম্নমত প্রশ্ন করবেন—

(১) বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত কবির নাম কর।

(২) বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে ?

পাঠ ঘোষণা—আজ আমরা যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন' নামক নিবন্ধটি পড়রো। নিবন্ধটি লেখকের 'মধুসূদনের জীবন চরিত' নামক বৃহৎ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কাব্যানুরাগই যে কবি মধুসূদনের বিচিত্র অধ্যয়ন ও কাব্য প্রভৃতি সৃষ্টির মূল—এ প্রবন্ধ পড়ে সে কথা আমরা জানবো।

উপস্থাপন—শিক্ষকমহাশয় একবার বা একাধিকবার আজকের পাঠ্যাংশটির আদর্শ পাঠ দেবেন এবং ছাত্রদের কয়েকজনকে পড়তে বলবেন। তারপর শিক্ষকমহাশয় এক একটি অনুচ্ছেদ পড়বেন এবং নিম্নরূপ প্রশ্ন ও আলোচনা করবেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ নিজের উচ্চাভিলাষ......পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

পঠদ্দশায়—পঠতের দশা, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

বিদ্যোপার্জন—বিদ্যা + উপার্জন।

তেলেগু, তামিল—দক্ষিণ-ভারতের দুটি প্রাচীন ভাষা।

হিব্রু—ইহুদী জাতির প্রাচীন ভাষা।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম—লণ্ডনে অবস্থিত বিখ্যাত গ্রন্থাগার ও যাদুঘর।

(১) মধুসূদনের চরিত্রে তোমরা কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর ?

(২) মাদ্রাজে থাকবার সময় তিনি কি কি ভাষা শিখেছিলেন ?

(৩) ফ্রান্স প্রবাসেব সময় তিনি কোন কোন ভাষা শিখেছিলেন ?

(৪) স্বদেশ এবং বিদেশেব কোন কোন গ্রন্থাগারেব সহায়তায় তিনি নিজের জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন ?

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : রোগ, দরিদ্রতা · · প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন।

নিত্য প্রবহণশীল—যাহা সর্বদা বহিয়া যায় এরূপ। প্রবহণ হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রীহি, নিত্য যে প্রবহণশীল (সুপ্‌সুপা)।

নিদাঘ—গ্রীষ্মকাল।

(১) জীবনে কি কি বাধা মানুষের জ্ঞানপিপাসা নষ্ট করে দেয় ?

(২) মধুসূদনেব জীবনে এই সমস্ত বাধা সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞানস্পৃহা কোনদিন কমেনি কেন ?

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মধুসূদন বহু ভাষ৷ কণ্ঠস্থ করিতেন।

নিষ্কর্ষ—মূল।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। এই কাব্য রচনা করে তিনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেছিলেন।

কণ্ঠস্থ—কণ্ঠে স্থিতি করে যাহা, উপপদ তৎ।

(১) মধুসূদনের সমস্ত শিক্ষা ও অধ্যয়নের মূলে কি ছিল ?

(২) কাব্যানুরাগ মধুসূদন কোথা থেকে পেয়েছিলেন ?

(৩) বাল্যকালে কোন কোন কাব্যগ্রন্থ মধুসূদনের কাব্যানুরাগ বৃদ্ধি করেছিল ?

(৪) সে যুগের মহিলা হয়েও, মধুসূদনের মায়ের কি বৈশিষ্ট্য ছিল ?

অভিযোজন—প্রবন্ধটি ছাত্ররা কতটা অনুধাবন বা উপভোগ করেছে তা জানবার জন্য শিক্ষকমহাশয় নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করবেন—

(১) মধুসূদনের জন্মগত বিদ্যানুরাগের কি পরিচয় এ নিবন্ধে আমরা পাই ?

(২) মহাকবি মধুসূদনের জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাব কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ?

বাড়ির কাজ—ছাত্ররা আজকের পডাটি ভালো করে বাড়িতে আয়ত্ত কববে এবং যাদেব পক্ষে সম্ভব তারা মধু কবিব "আত্মবিলাপ" কবিতাটি পডে নেবে।

মধ্যাহ্নে

অক্ষয়কুমার বড়াল

একেলা জগৎ ভুলে পড়ে আছি নদীকূলে
পড়েছে নধব বট হেলে ভাঙা তীবে ,
ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি কাঁপিছে সমীরে ।
চাতক কাতবে ডাকে, চবে বক নদী-বাঁকে,
ডাকে কুবো কুব্ কুব্ লুকায়ে কোথায় ।
গাভী শুয়ে তরুতলে, হংসী ডুবে উঠে জলে,
ডিঙাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘবে যায় ।
দূবেতে পথিক দুটি চ'লে যায গুটি গুটি
মেঠো পথ দিযা ।
পাশ দিয়ে নিযে জল আঁখি দুটি ঢল ঢল,
কুলবধূ দ্রুত গেল লাজে চমকিযা ।

নিঝুম মধ্যাহ্নকাল অলস-স্বপন-জাল
বচিতেছে অন্য মনে হৃদয ভবিযা
দূব মাঠ-পানে চেযে চেযে চেযে শুধু চেযে
বযেছি পডিয়া ।
হৃদয এলাযে পড়ে যেন কী স্বপন-ভবে,
মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কি আরামে !
অন্য মনে চাহি চাহি কত ভাবি, কত গাহি,
পড়িছে গভীর শ্বাস গানের বিবামে ।
খ'সে খ'সে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছাযা-ছায়া কত ব্যথা ঘুবে ধরাধামে ।

——

পাঠটীকা—২

তারিখ—

শ্রেণী—নবম

ছাত্রসংখ্যা— বিষয়—বাংলা কবিতা

গড় বয়স— পাঠ পরিচয়—'মধ্যাহ্নে'

সময়— —অক্ষয়কুমার বড়াল

শিক্ষক— অদ্যকার পাঠ—সমগ্র কবিতা

উদ্দেশ্য—(১) কবিতাটির রস ও শিল্প-সৌন্দর্য উপভোগ করতে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(২) কবির চিন্তাধারা অনুসরণে ছাত্রদের সাহায্য করা; কবিচিত্তের আবেদন ছাত্রচিত্তে পৌঁছে দেওয়া।

(৩) যাতে ছাত্রদের কবিতাপাঠে আগ্রহ ও কবিতাবোধের ক্ষমতা জন্মে সে-বিষয়ে তাদের সাহায্য করা।

আয়োজন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতার শুরুতে দিনের একটি বিশেষ সময় বর্ণনা করেছেন এই ভাবে ঃ

'শরতের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
... ... স্নিগ্ধ অশ্বত্থের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে। যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম
শুধু মোর ঘরে নাই বিশ্রামের ঘুম।'

—এখানে দিনের কোন সময়টির বর্ণনা করা হয়েছে?

পাঠঘোষণা—আজ আমরা কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মধ্যাহ্নে' কবিতাটি পড়ে পল্লীবাংলার মধ্যাহ্নের রূপটির পরিচয় পাব এবং তা কবির অন্তর কিভাবে স্পর্শ করেছে তা উপলব্ধি করব।

উপস্থাপন—শিক্ষকমহাশয় সমগ্র কবিতাটির এক বা একাধিকবার আদর্শ পাঠ দেবেন এবং পাঠান্তে কয়েকটি ছাত্রকে কবিতাটি পাঠ করতে বলবেন। পাঠে কোথাও দোষ হলে শিক্ষক তা সংশোধন করে দেবেন।

শিক্ষকমহাশয় এবার কবিতাটিকে দুটি অংশে ভাগ করে প্রথম অংশ আবার

পড়বেন এবং অংশের চিত্র-সৌন্দর্য, ধ্বনি-সৌন্দর্য, শব্দব্যবহারকৌশল প্রভৃতি আলোচনা করবেন এবং ছাত্রদের কবিতাটির মর্ম ও রসোপলব্ধি কতটা হল জানবার জন্য নিম্নমত প্রশ্ন করবেন—

প্রথম অংশ ঃ একেলা জগৎ ভুলে .... রয়েছি পড়িয়া।

১। যে শব্দ বা বাক্যাংশগুলিতে নীচে-লেখা অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে, সেগুলি খুঁজে বের কর।

(ক) সতেজ, সুপুষ্ট (খ) বাতাসে (গ) ধীরে ধীরে, নিঃশব্দ পদক্ষেপে (ঘ) নিস্তব্ধ

২। কবিতার যে বাক্যাংশগুলিতে নীচে লেখা ভাব প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি বল।

(ক) বাইরে ও অন্তরে—দুদিকেই কবি নিঃসঙ্গ

(খ) মধ্যাহ্নে মন্থরভাবে বাতাস বইছে

(গ) নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন কবির মনে স্বপ্নের আবেশ আনছে

দ্বিতীয় অংশ ঃ হৃদয় এলায়ে পড়ে ··· ধরাধামে,

(ক) নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কবির চিত্তে আলস্য, দেহে আলস্য—কবি কি ভাষায় একথা প্রকাশ করেছেন ?

(খ) কবি কি ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে মধ্যাহ্নে নিঃসঙ্গ কবির মন ব্যথাতুর হয়েছে ?

(গ) কবির ব্যথার স্মৃতিগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাদের তীব্রতা নেই—কবি কী ভাষায় এভাব ব্যক্ত করেছেন ?

অভিযোজন ঃ

(ক) কবি মধ্যাহ্নে নদীতীরের কি চিত্র এঁকেছেন ?

(খ) কবির চিত্তে মধ্যাহ্ন কী প্রভাব বিস্তার করেছে ?

(গ) কবিতাটির নাম মধ্যাহ্ন না দিয়ে কবি 'মধ্যাহ্নে' নাম দিলেন কেন ?

(ঘ) কবিতাটির কোন্ কোন্ বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছ তোমাদের ভাল লেগেছে বল।

বাড়ির কাজ—

কবিচিত্তে মধ্যাহ্নের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখে আনতে বলা হবে। যারা আগ্রহশীল তারা রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী'র অন্তর্গত "মধ্যাহ্ন" কবিতাটি পড়ে নেবে।

রুইদাস

(খগেন্দ্রনাথ মিত্র)

"দিন আর চলে না। জুতার ব্যবসায়ে লাভ নাই। দেশে অন্ন নাই, জুতা কিনিবে কে? বাজারে গিয়া রুইদাস জুতা লইয়া বসিয়া থাকে। কেহ ফিরিয়াও চাহে না। সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘনাইয়া আসে, তখন রুইদাস কোনও বৈষ্ণবের দ্বারে গিয়া জুতা রাখিয়া আসে। ভিতরে প্রবেশ করে না, পাছে অশুচি বলিয়া কেহ গালি দেয়। সে যে অস্পৃশ্য—ঘৃণ্য। তাহার কেহ নাই এ সংসারে। সে চোরের মত আপনাকে যথাশক্তি গোপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। যেদিন নিতান্ত অচল হয়, সেদিনও সে কাহারও গৃহে গিয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য দাঁড়াইতে সাহস করে না, পাছে গৃহ অপবিত্র হইয়া যায় তাহার দূষিত অঙ্গস্পর্শে। সে আপনার গৃহের কোণে কোনরূপে শীত, বর্ষা, রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতার ভজন করে। কেহ সে ভজনের কথা জানে না, কেহ ভাবেও না যে, তাহারও ভগবান আছেন! কেহ জানে না বলিয়াই তাহার ভজনে কোনও বাধা হয় না।

দারিদ্র্য যতই পীড়া দেয়, ক্ষুধায় দেহ যতই এলাইয়া পড়ে, ততই সে তাহার প্রাণের দেবতাকে চোখের জলে অভিষেক করিয়া লয়। এমন সময় এক সাধু আসিলেন। রুইদাস তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া সেই পাদোদক পান করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সাধুর কৃপা হইল, রুইদাসের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার মনে করুণা হইল। তিনি বলিলেন,—

'রুইদাস, তোমার দুঃখে আমি ব্যথিত হইয়াছি। কি করিলে তোমার দুঃখ দূর করিতে পারি, বল।'

রুইদাস বলিল, 'প্রভু, কোন দুঃখ নাই, একমাত্র দুঃখ এই যে, আমি অস্পৃশ্য, তোমার সেবা করিতে পারিলাম না।'

সাধু বলিলেন, 'আমি তোমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর গ্রহণ কর।'

রুইদাস নিবেদন করিল, 'প্রভু, আমার প্রতি রঘুবরের কৃপা হউক, এই বর প্রদান করুন। অন্য কিছু প্রার্থনা করি না।'

সাধু বলিলেন, 'তথাস্তু। কিন্তু তোমার এই দারিদ্র্য-দুঃখ আমাকে পীড়া

দিতেছে। তুমি এই প্রস্তরখানি গ্রহণ কর। ইহাতে তোমার অভাব-মোচন হইবে।'

এই কথা বলিয়া সাধু তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য রুইদাসের হাতুড়িতে প্রস্তরখণ্ড ঠেকাইলেন। হাতুড়ি দেখিতে দেখিতে স্বর্ণ হইয়া গেল। তখন রুইদাস 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। সাধু হাসিলেন, ভাবিলেন—'মূর্খ রুইদাস ; অভাবে পড়িলেই সে এই স্পর্শমণির মূল্য বুঝিবে!'

সাধু চলিয়া গেলে, রুইদাস ভাবিতে লাগিল, কে এই সাধু ? আমি দীন-ভাবে গৃহের কোণে পড়িয়া থাকি, কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি না। তবে আমার এই বিড়ম্বনা কেন? সাধুর বেশ ধরিয়া কে আমার এই অনিষ্ট করিতে আসিল ?

রুইদাস তাহার ইষ্টদেবতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। বলিল, দুঃখের দেবতা, আমার দুঃখের মধ্য দিয়া আমার বুকে আসিয়াছ। এরা তোমাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য ফাঁদ পাতিতেছে। তুমি যেন আমায় ফাঁকি দিও না।'

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া রুইদাস সুস্থ হইল। তাহার হৃদয়ে আবার বিমল শান্তি ফিরিয়া আসিল।

রুইদাস সে স্পর্শমণির কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এবার তাহার দুঃখ-দৈন্য ভৈরবী মূর্তিতে আসিয়াছে। চালে খড় নাই, দেহে বস্ত্র নাই, ঘরে অন্ন নাই। দুই এক জোড়া জুতা কখনও কখনও প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু তাহা বৈষ্ণবগণকে দান করা ব্যতীত অন্য কোন উপকারে লাগে না। বৈষ্ণবেরা আশীর্বাদ করেন, 'তোমার ধর্মে মতি হউক।' রুইদাস সেই আশীর্বাদের শান্তিজল মস্তকে লইয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসে।

সাধু পুনরায় আসিলেন। দেখিলেন, সেই জীর্ণ কুটীর তেমনই আছে। রুইদাসের শীর্ণ দেহ কঙ্কালসার হইয়াছে। কৌতূহলাবিশিষ্ট হইয়া সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রুইদাস, তোমার দুঃখ ত' ঘুচিল না ?'

রুইদাস বিনীতভাবে উত্তর করিল, 'প্রভু, দুঃখ ঘুচিলে যে দুঃখের ঠাকুরকে হারাইব।'

'যাক, তুমি আমার স্পর্শমণি কি করিলে ?'

রুইদাসের মণির কথা মনে পড়িল, তাহার চালের বাতা হইতে প্রস্তরখণ্ড আনিয়া সে সাধুকে ফিরাইয়া দিল। বলিল, 'প্রভু, আর আমাকে লোভ দেখাইবেন না। আমি আপনাকে প্রণাম করি।'

পাঠটীকা—৩

তারিখ—

শ্রেণী—অষ্টম | বিষয়—বাংলা দ্রুতপঠন

ছাত্রসংখ্যা— | অদ্যকার পাঠ—রুইদাস (গল্প)

গড় বয়স— | —খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সময়—

শিক্ষক—

উদ্দেশ্য (ক) আলোচ্য গল্পটির মর্মগ্রহণে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(খ) গল্পটি পাঠের মাধ্যমে ছাত্রদের সাহিত্যপাঠে আগ্রহ বাড়িয়ে তুল্‌তে সহায়তা করা।

আয়োজন—নিম্নানুরূপ প্রশ্নের সাহায্যে পাঠের আয়োজন করা হবে—

(১) সন্ন্যাসীরা ঐশ্বর্য, ভোগ, সুখ প্রভৃতি সেচ্ছায় ত্যাগ করে দুঃখ বরণ করেন কেন?

(২) দুখের বেশেতে এসেছ বলিয়া
তোমারে নাহিক ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা সেখানে তোমারে
নিবিড় করিয়া ধরিব হে।

এই পংক্তি কটিতে কবি কি বলতে চেয়েছেন?

(৩) রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্ফল উপহার' আর 'স্পর্শমণি' কবিতা কে কে পড়েছো? কবিতা দুটির কাহিনী কে বলতে পারো?

পাঠ ঘোষণা—আজ আমরা এক দরিদ্র অস্পৃশ্য মুচির গল্প পড়বো যিনি তাঁর ইষ্টদেবতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করে পার্থিব সব সম্পদকে অবজ্ঞা করেছেন, এবং দুঃখকেই ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট পথ জেনে স্বেচ্ছায় দুঃখ-দারিদ্র্যভরা জীবন যাপন করেছেন। গল্পটি লিখেছেন প্রখ্যাত বৈষ্ণব-সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র; গল্পটির নাম 'রুইদাস'।

উপস্থাপন—এবার ছাত্রদের গল্পটির প্রথম থেকে 'অভাবে পড়িলেই সে এই স্পর্শমণির মূল্য বুঝিবে'—পর্যন্ত নীরবে পড়তে বলা হবে। নীরব পাঠ হয়ে গেলে পর নীচে-লেখা প্রশ্ন ক'টি জিজ্ঞেস করে ছাত্ররা পঠিত অংশের মর্ম গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা জেনে নেওয়া হবে।—

রুইদাসের মনে সব চেয়ে বড় ব্যথা কি ছিল ?

সাধু এলে পর রুইদাস কিভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন ?

সাধুর অনুরোধে রুইদাস তাঁর কাছে কি বর চাইলেন ?

সাধু তাঁকে কি দিয়েছিলেন ?

উপরের প্রশ্ন ক'টির উত্তর যথাযথভাবে আলোচিত হবার পর ছাত্রদের "সাধু চলিয়া গেলে" থেকে গল্পটির শেষ পর্যন্ত নীরবে পড়তে বলা হবে এবং পড়া শেষ হলে নীচের প্রশ্ন ক'টি করা হবে—

সাধু চলে যাবার পর রুইদাস সাধু সম্বন্ধে কি ভাবলেন ?

সাধু কিছুকাল পরে ফিরে এসে রুইদাসের কি অবস্থা দেখলেন ?

রুইদাস সাধুকে স্পর্শমণি ফিরিয়ে দিয়ে কি বললেন ?

অভিযোজন—নীরবে দ্রুত পাঠ করে ছাত্ররা সমগ্র গল্পটির রসাস্বাদন ও মর্মগ্রহণ করতে পেরেছে কিনা জানবার জন্য এবং এ-বিষয়ে আরও খানিকটা সহায়তা করবার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করা হবে—

(১) সাধুর দেওয়া স্পর্শমণির স্পর্শে যখন লোহার হাতুড়ি সোনা হয়ে গেল, তখন দরিদ্র রুইদাস 'হায়, হায়' করে উঠ্‌লেন কেন ?

(২) স্পর্শমণি পেয়ে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে কেন কাঁদলেন রুইদাস ?

(৩) অল্প কথায় দরিদ্র রুইদাসের চরিত্র বর্ণনা কর।

দ্রুতপঠনের পাঠকে বলা হয় ধারণা পাঠ, **reading for comprehension.** এ-পাঠ অন্যভাবেও পরিচালনা করা যায়। নীচে তা দেখানো গেল। উপস্থাপনের সময় গল্পটি সম্পর্কে ছাত্রদের গল্পের মূল বিষয়গুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং সেই লেখা লক্ষ্য রেখে ছাত্ররা সমগ্র গল্পটি নীরবে দ্রুত পড়বে।

(১) রুইদাসের মনের সব চেয়ে বড় ব্যথা।

(২) রুইদাসের প্রতিদিনের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবন।

(৩) রুইদাসের সাধুর কাছে বর প্রার্থনা।

(৪) স্পর্শমণি পেয়ে রুইদাসের মনের অবস্থা।

(৫) সাধুদত্ত স্পর্শমণি দিয়ে দারিদ্র্য মোচন না করার কারণ।

(৬) রুইদাসের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা।

(৭) সাধুর প্রতি রুইদাসের শেষ উক্তি।

অভিযোজন—বোর্ডে উপরি-উক্ত লেখাগুলো লক্ষ্য করে ছাত্ররা নীরব পাঠ শেষ করলে পর নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করা হবে।

(১) রুইদাসের প্রতিদিনের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবন বর্ণনা কর।

(২) স্পর্শমণি পেয়ে রুইদাস কাঁদলেন কেন?

(৩) রুইদাস স্পর্শমণি পেয়েও তা দিয়ে নিজের সুখৈশ্বর্যের ব্যবস্থা করেননি কেন?

(৪) সাধুকে রুইদাস কি কথা বলে স্পর্শমণিটি ফিরিয়ে দিলেন?

(৬) রুইদাস গল্পের এই সাধু সম্বন্ধে তোমাদের কি মনে হয়?

পাঠটীকা—৪

তারিখ—

শ্রেণী—সপ্তম

ছাত্রসংখ্যা— বিষয়—বাংলা ব্যাকরণ

গড় বয়স— অদ্যকার পাঠ—বহুব্রীহি সমাস

সময়—

শিক্ষক—

উদ্দেশ্য—(ক) বাংলা ব্যাকরণের বহুব্রীহি সমাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন এবং ঐ সমাস-নিষ্পন্ন পদগুলির প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন।

(খ) ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্তি ও বিচার শক্তির বিকাশ।

উপকরণ—ব্যাকরণ পুস্তক, ইত্যাদি

আয়োজন—নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দ্বারা ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করব এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে নূতন পাঠের ঘোষণা করব।

(১) দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে ?

(২) দ্বন্দ্ব সমাসের ক'টি উদাহরণ দাও।

(৩) দ্বন্দ্ব সমাসে কোন্ পদের প্রাধান্য থাকে ?

পাঠ ঘোষণা—আজ আমরা এমন একটি সমাসের কথা শিখব যা দ্বন্দ্ব সমাসের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ যাতে কোন পদেরই প্রাধান্য থাকে না।

উপস্থাপন—নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি বোর্ডে লিখে দেব।

দশ আনন যার = দশানন (রাবণ)

পীত অম্বর যার = পীতাম্বর (কৃষ্ণ)

নীল (বিষ) কণ্ঠে যার = নীলকণ্ঠ (শিব)

চন্দ্র চূড়ায় যার = চন্দ্রচূড় (শিব)

ছাত্র-ছাত্রীরা উদাহরণগুলি আলোচনা করলে পর বহুব্রীহি সমাসের নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি বোর্ডে লিখে দেব, ছাত্রগণ উদাহরণগুলি ও সংজ্ঞাটি নিজ নিজ খাতায় লিখে নেবে।

যে সমাসে যে দুই পদের সমাস হয় তাদের কোনটিকে না বুঝিয়ে তাদের দ্বারা লক্ষিত অন্য কোন একটিকে প্রধানরূপে বুঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

অভিযোজন—(ক) নিম্নলিখিত সমাস-বাক্যগুলি নিয়ে সমস্তপদ গঠন করতে নির্দেশ দেব এবং প্রয়োজনমত সহায়তা করব।

(১) ধর্মে বুদ্ধি যার

(২) শূল পাণিতে যার

(৩) দশ হাত (পরিমাণ) যার

(৪) আট বছর (বয়স) যার

(৫) বে (অর্থাৎ নাই) আদব যার

(৬) শিক্ষা ব্রত যার

(৭) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার

(৮) নাই অন্ত যার

(৯) হত ভাগ্য যার

(১০) মা মরা যার

বাড়ির কাজ—পাঠ্য সাহিত্য-পুস্তক থেকে দশটি বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন পদ সংগ্রহ করে আনতে বলব।

পাঠটীকা—৫

তারিখ—

শ্রেণী—ষষ্ঠ

বিষয়—প্রবন্ধ-রচনা

ছাত্রসংখ্যা—

অদ্যকার পাঠ—শরতের শোভা

গড় বয়স—

সময়—

শিক্ষক—

উদ্দেশ্য—ছাত্রদের শতবের শোভা সম্বন্ধে সবল ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে সহায়তা করা।

তাদের চিন্তা, কল্পনাশক্তি ও মাতৃভাষায় রচনাশক্তির বিকাশে সহায়তা করা।

উপকরণ ঃ

আয়োজন—ছাত্রদের মন পাঠাভিমুখী করবার জন্য নীচের প্রশ্ন ক'টি জিজ্ঞেস করা হবে।

(১) বছরে ক'টি ঋতু ? ঋতুগুলির নাম কি ?

(২) কোন্ ঋতুতে পূজোর ছুটি হয় ?

পাঠ ঘোষণা—আজ আমরা শরৎকালের প্রাকৃতিক শোভা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে শিখব।

উপস্থাপন—আলোচনার সুবিধার জন্য ছাত্রদের সহযোগিতায় রচনাটিকে কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করে নেওয়া হবে এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রতি শীর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

(ক) সূচনা, (খ) শরতের শোভা (গ) উপসংহার।

(ক) **সূচনা**—

১। কোন্ কোন্ মাস নিয়ে শরৎকাল ?

২। শরৎকাল কোন্ ঋতুর পরে আসে ?

(খ) **শরতের শোভা**—

১। শরৎকালে আকাশের শোভা কেমন ?

২। পল্লীবাংলার ক্ষেতগুলির দৃশ্য কেমন ?

[এই উদ্ধৃতি দিয়ে ছাত্রদের সাহায্য করা হবে ঃ

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালো
সাদা মেঘের ভেলা। —রবীন্দ্রনাথ]

৩। শরতে কি কি ফুল ফোটে ?

৪। শারদ প্রাতে বাংলাদেশের মাঠগুলির দৃশ্য কেমন হয় ?

৫। নদী-খাল প্রভৃতির অবস্থা কেমন হয় ?

[এই উদ্ধৃতি দিয়ে ছাত্রদের সাহায্য করা হবে ঃ

শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরাফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে —রবীন্দ্রনাথ]

(গ) **উপসংহার**—

(১) বাংলাদেশে শরৎকে কেন শ্রেষ্ঠ ঋতু বলা যেতে পারে ?

উপরের আলোচনা অবলম্বন করে নীচের সংকেতগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে, ছাত্ররা তা নিজের খাতায় লিখে নেবে।

১। সূচনা—বছরে ছ'টি ঋতু, বর্ষার পরে শরৎ, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতির শোভার পরিবর্তন।

২। শরতের শোভা—আকাশ সুন্দর, নির্মল, নীল ; গাছপালা সতেজ সজীব ; মাঠে সবুজ ধান ; নদী খাল বিল কানায় কানায় ভরা।

৩। উপসংহার—প্রাকৃতিক শোভা, আনন্দ-উৎসব—সব মিলে বাংলা দেশে শরৎই শ্রেষ্ঠ ঋতু।

অভিযোজন—শ্রেণীকক্ষের আলোচনা অবলম্বন করে ছাত্ররা শরতের শোভা সম্বন্ধে ১০টি বাক্য লিখবে। এ-বিষয়ে প্রয়োজনমত ছাত্রদের সহায়তা করা হবে এবং কয়েকজনের রচনা সম্ভব হলে সংশোধন করে দেওয়া হবে।

বাড়ির কাজ—ছাত্ররা আজকের আলোচনা অবলম্বন করে শরতের শোভা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে আনবে এবং এজন্য রবীন্দ্রনাথের 'শারদ-লক্ষ্মী' ও 'বঙ্গে শরৎ' কবিতা দুটি বাড়িতে পড়ে নেবে।

পাঠটীকা—৬

শ্রেণী—সপ্তম/অষ্টম

* * * বিষয়—বাংলা ব্যাকরণ। কারক।

* * * অদ্যকার পাঠ—কর্মকারক।

উদ্দেশ্য ঃ (ক) ছাত্রদের কর্মকারক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সহায়তা করা

(খ) শুদ্ধ ভাষা বলতে ও লিখতে সহায়তা করা

(গ) ছাত্রদের যুক্তি ও বিচারশক্তি বিকাশে সহায়তা করা

আয়োজন ঃ ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ও অদ্যকার পাঠে তাদের মন আকৃষ্ট করবার জন্য শিক্ষকমহাশয় নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

(১) কারক কাকে বলে ?

(২) কর্তৃকারক কাকে বলে ?

(৩) কর্তৃকারকে সাধারণতঃ কোন্ বিভক্তি হয় ?

(৪) প্রথমা বিভক্তি ছাড়া কর্তৃকারকে আর কোন্ কোন্ বিভক্তি হয় ?

পাঠঘোষণা ঃ আজ আমরা কর্মকারক সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উপস্থাপন ঃ

(১) আমি লোকটিকে দেখেছি।

(২) সবারে বাসরে ভাল।

(৩) সুশীলা বই কিনেছে।

(৪) প্রধান শিক্ষকমহাশয় আমাদের ইংরেজী পড়ান।

(৫) আমি তোমাদের গল্প বলব।

(৬) তিনি আমায় ভালবাসেন।

উপরের বাক্যগুলি অবলম্বন করে শিক্ষকমহাশয় কর্ম, দ্বিকর্মক ক্রিয়া, মুখ্য ও গৌণকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং বাক্যগুলিতে কর্মে যে-সব বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ছাত্রদের সহায়তায় সেগুলি স্থির করে বাক্যগুলির পাশে লিখবেন। সর্বশেষে ছাত্রদের সহায়তায় কর্মকারকের সংজ্ঞা স্থির করে বোর্ডে লিখে দিবেন।

অভিযোজন ঃ

(ক) নীচের বাক্যগুলি থেকে কর্ম বেছে বের কর এবং কর্মের বিভক্তি বল।

(১) 'মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে'।

(২) ছেলেদের ডেকে আন।

(৩) 'ধবলীরে আন গোহালে।'

(৪) আমি তোমায় ভাল বলে জানতাম।

(৫) দীনে দয়া কর।

(৬) 'জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।'

(খ) ডানদিকের বন্ধনী-ঘেরা নির্দেশ অনুসরণ করে শূন্য স্থানে উপযুক্ত কর্ম বসাও।

(১) আমি তোমায় আজ—দেখাব (কর্মে ১মা)

(২) সেই—আমি চিনি না (কর্মে ২য়া)

(৩) আমি—আচ্ছা করে শিক্ষা দেব (কর্মে ষষ্ঠী)

(৪) —বলো না কিছু (কর্মে ৭মী)

বাড়ির কাজ ঃ সাহিত্য পুস্তকের—গল্পটি থেকে কর্মপদগুলি খুঁজে বের কর এবং প্রতি ক্ষেত্রে কোন্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে উল্লেখ কর।

পাঠটীকা—৭

শ্রেণী—অষ্টম/নবম বিষয়—বাংলা ব্যাকরণ।

* * * অদ্যকার পাঠ—কয়েকটি সংস্কৃত ও

* * * বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা

উদ্দেশ্য : (ক) কৃৎ-প্রত্যয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে এবং কতগুলি কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের গঠন ও প্রয়োগে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(খ) শুদ্ধ ও ব্যাকরণসম্মত ভাষা বলতে ও লিখতে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(গ) ছাত্রদের চিন্তা, যুক্তি ও বিচার শক্তির বিকাশে সহায়তা করা।

আয়োজন : ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে বর্তমান পাঠের প্রতি তাদের আগ্রহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করব।

(১) শব্দ ও পদের পার্থক্য বুঝিয়ে বল।

(২) ধাতু ও ক্রিয়াতে পার্থক্য কি ?

(৩) যদু বাড়ি যাইতেছে। সে বই পড়িতেছিল। তুমি কি এখন স্কুলে যাইবে ?

উপরের ক্রিয়াপদগুলিতে ধাতুর শেষে কি কি বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয়েছে ? ব্যাকরণের ভাষায় এই ধরনের বর্ণসমষ্টিকে আমরা কি বলি ?

(৪) **ফুটন্ত** জলে হাত দিও না। **ডুবুরী** সমুদ্রে ডুব দেয়। যতীন খুব **পড়ুয়া** ছেলে। **দাতব্য** হাসপাতালে লোকটির মৃত্যু হল।

উপরের **নিম্নরেখ** পদগুলিতে মূল ধাতুর সঙ্গে কি কি বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয়েছে ?

পাঠঘোষণা : যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে, তাকে বলা হয় কৃৎ-প্রত্যয়। উপরের বাক্যগুলিতে 'অন্ত', 'উরী', 'উয়া', 'তব্য' প্রভৃতি কৃৎ-প্রত্যয়।

আজ আমরা কতগুলি সংস্কৃত ও বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়ের ব্যবহার শিখব।

. **উপস্থাপন ঃ**

এবার আজকের পাঠটিকে কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করে প্রত্যেকটি শীর্ষে কতগুলি কৃদন্ত শব্দ ও তাদের ব্যুৎপত্তি লিখে দেব। তারপর ছাত্রদের সহায়তায় কৃৎ-প্রত্যয়গুলির ব্যবহারের নিয়ম স্থির করে বোর্ডে লিখে দেব।

প্রথম শীর্ষ—

দ্রষ্টব্য = দৃশ্ + তব্য	দর্শনীয় = দৃশ্ + অনীয়	পেয় = পা + য (যৎ)
গন্তব্য = গম্ + তব্য	করণীয় = কৃ + অনীয়	কার্য = কৃ + য (ণ্যৎ)
দাতব্য = দা + তব্য	পূজনীয় = পূজ্ + অনীয়	শিষ্য = শাস্ + য (ক্যপ)

(ক) উপরের শব্দগুলি ব্যবহার করে এক একটি বাক্য রচনা কর।

(খ) প্রত্যেক বাক্যে কৃদন্ত পদগুলি কি অর্থ প্রকাশ করছে বল।

সূত্র—উচিত অথবা যোগ্য অর্থে ধাতুর উত্তর 'তব্য', 'অনীয়' ও 'য' প্রত্যয় হয়।

দ্বিতীয় শীর্ষ—

দৃষ্টি = দৃশ্ + ক্তি	দৃষ্ট = দৃশ্ + ক্ত	দর্শন = দৃশ্ + অনট্	লাভ = লভ্ + ঘঞ্
সৃষ্টি = সৃজ্ + ক্তি	সৃষ্ট = সৃজ্ + ক্ত	সৃজন = সৃজ্ + অনট্	ত্যাগ্ = ত্যজ্ + ঘঞ্
উক্তি = বচ্ + ক্তি	উপ্ত = বপ্ + ক্ত	ভোজন = ভুজ্ + অনট্	শোক = শুচ্ + ঘঞ্

সূত্র—ধাতু থেকে বিশেষ্য গঠনে ঘঞ্, অনট্, ক্তি প্রভৃতি এবং বিশেষণ গঠনে ক্ত প্রত্যয় খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। বদ্, বচ্, বপ্ প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করলে 'ব' স্থানে 'উ' আদেশ হয়।

তৃতীয় শীর্ষ—

নাচন = নাচ্ + অন	জানান = জানা + আন	কান্না = কাঁদ্ + না
খাওন = খা + অন	শোনান = শোনা + আন	ঝরণা = ঝর্ + না
		লড়াই = লড়্ + আই

সূত্র—ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য সৃষ্টি করার জন্য সাধারণতঃ ধাতুর উত্তর অন, আন, না, আই প্রভৃতি যোগ করা হয়।

চতুর্থ শীর্ষ —

চলন্ত = চল্ + অন্ত	**কমতি = কম্ + তি**
ঘুমন্ত = ঘুম্ + অন্ত	**উঠতি = উঠ্ + তি**

সূত্র—'এরূপ করছে', 'এরূপ অবস্থায় আছে'—এই অর্থে ধাতুর উত্তর 'অন্ত' এবং 'তি' প্রত্যয় যুক্ত হয়। এই দুই প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

অভিযোজন ঃ

আজকের পাঠ ছাত্রেরা কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছে তা পরীক্ষা করবার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। নীচের বাক্যগুলির অন্তর্গত কৃদন্ত পদগুলির ব্যুৎপত্তি বল ঃ

(ক) দাতব্য হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছিল।

(খ) অনেকদিন বৃষ্টি না হওযায় সর্বত্র পানীয় জলেব অভাব দেখা দিয়েছে।

(গ) ঈশ্বর তাঁর নিজের সৃষ্টিতে নিজেই মুগ্ধ।

(ঘ) তোমার অন্যায় উক্তির জন্য অনুতাপ করা উচিত।

(ঙ) যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

(চ) একথা তাকে জানান হয়নি।

(ছ) আজ ঘরে চাল বাড়ন্ত।

বাড়ির কাজ ঃ

পাঠটীকা – ৮

শ্রেণী – অষ্টম/নবম বিষয় – বাংলা ব্যাকরণ।

* * * অদ্যকার পাঠ – কয়েকটি সংস্কৃত

* * * ও বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়।

উদ্দেশ্য ঃ (ক) শুদ্ধ ও ব্যাকরণসম্মত ভাষা বলতে ও লিখতে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(খ) ব্যাকরণের তদ্ধিত প্রত্যয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন ও তদ্ধিতান্ত শব্দগুলির প্রয়োগে দক্ষতা-অর্জন করতে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(গ) ছাত্রদের চিন্তা, যুক্তি ও বিচার শক্তির বিকাশে সহায়তা করা।

আয়োজন ঃ ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে বর্তমান পাঠের প্রতি তাদের আগ্রহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করব।

(১) প্রত্যয় কাকে বলে ?

(২) কৃৎপ্রত্যয় বলতে কি বুঝ ?

(৩) কৃদন্তপদ কাকে বলে ?

(৪) ফলওয়ালা, ছেলেমি, মনুষ্যত্ব, মজুরি, আনন্দিত, মজাদার— প্রভৃতি শব্দে মূল শব্দের সঙ্গে যে-যে বর্ণসমষ্টি বা প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে সেগুলি বল।

পাঠঘোষণা ঃ শব্দের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নূতন শব্দ গঠন করে তাদের বলে তদ্ধিত প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে যেসব নূতন শব্দ তৈরি হয় তাদের বলে তদ্ধিতান্ত শব্দ। তদ্ধিত প্রত্যয় দুই প্রকার – (১) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় (২) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়।

আজ আমরা কয়েকটি সংস্কৃত ও বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের আলোচনা করব।

উপস্থাপন ঃ আজকের পাঠটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে পাঠ পরিচালনা করব। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রত্যেক অংশে কতগুলি শব্দ

ও তাদের ব্যুৎপত্তি বোর্ডে লিখে দেব এবং ছাত্রদের সহযোগিতায় শব্দগুলির গঠনসম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথম অংশ—

পৌত্র = পুত্র + ষ্ণ	দৈত্য = দিতি + ষ্ণ্য
মানব = মনু + ষ্ণ	আদিত্য = অদিতি + ষ্ণ্য
সৌমিত্রি = সুমিত্রা + ষ্ণি	গাঙ্গেয় = গঙ্গা + ষ্ণেয়
রাবণি = রাবণ + ষ্ণি	ভাগিনেয় = ভগিনী + ষ্ণেয়

(ক) উপরের শব্দগুলি যোগে এক একটি বাক্য গঠন কর।

(খ) উপরিলিখিত শব্দগুলি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

সূত্র ঃ অপত্যার্থে 'ষ্ণ', 'ষ্ণি', 'ষ্ণ্য', 'ষ্ণেয়' প্রত্যয় নামপদের উত্তর যুক্ত হয়। এই তদ্ধিতান্ত পদগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় অংশ—

গুণ + ইন্ = গুণিন্ (পুং ১মা ১ব গুণী)	ধন + বতুপ্ = ধনবৎ (পুং ১মা ১ব ধনবান্)
ধন + ইন্ = ধনিন্ (পুং ১মা ১ব ধনী)	রুচি + মতুপ্ = রুচিমৎ (পুং ১মা ১ব রুচিমান্)
মেধা + বিন্ = মেধাবিন্ (পুং ১মা ১ব মেধাবী)	বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমৎ (পুং ১মা ১ব বুদ্ধিমান্)

সূত্র ঃ অস্তি, অর্থাৎ 'আছে' অর্থে শব্দের উত্তর ইন্, বিন্, বতুপ্ মতুপ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়।

তৃতীয় অংশ—

বড়াই = বড় + আই	গিন্নীপনা = গিন্নী + পনা
মিঠাই = মিঠা + আই	বীরপনা = বীর + পনা
মিতালী = মিতা + আলী	গলাবাজি = গলা + বাজি
ঠাকুররালী = ঠাকুর + আলী	ধাপ্পাবাজি = ধাপ্পা + বাজি

সূত্র ঃ ভাবার্থে শব্দের উত্তর 'আই', 'আলী', 'পনা' ও 'বাজি' প্রত্যয় যুক্ত হয়।

চতুর্থ অংশ—

দালালগিরি = দালাল + গিরি	পাহারাওয়ালা = পাহারা + ওয়ালা
কেরানীগিরি = কেরানী + গিরি	রিক্সাওয়ালা = রিক্সা + ওয়ালা

পূজারী = পূজা + আরী   মশালচী = মশাল + চী
শাঁখারী = শাঁখা + আরী   খাজানচী = খাজনা + চী

সূত্র ঃ ব্যবসায়ী বা কর্মী অর্থে শব্দের উত্তর—'গিরি', 'আরী', 'ওয়ালা' ও 'চী' প্রত্যয় যুক্ত হয়।

অভিজোযন ঃ

আজকেব পাঠ ছাত্রবা কতটা আয়ত্ত কবেছে জানবাব জন্য নীচের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করব।

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিব ব্যুৎপত্তি বল এবং শব্দগুলি দিয়ে বাক্য বচনা কর।

ধনী, শ্রীমান্, সাবল্য, পাণ্ডব, তবলচী, তেজস্বী, দাশবথি, শৈব, চৈতালী, কৌবব, কাঁসাবী, বলবান্ মাযাবী, নেতাগিবি।

পাঠটীকা—৯

শ্রেণী দশম—

* * * বিষয়—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

* * * আজকের পড়া--বৈষ্ণব গীতিকাব্য।

উদ্দেশ্য ঃ (ক) খ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা এবং তাঁদের পদাবলীর সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত হতে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের রস উপভোগ করতে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(খ) বাংলা কাব্য সাহিত্য পাঠে ছাত্রদের আগ্রহশীল করে তোলা।

আয়োজন ঃ ছাত্রদের মন পাঠাভিমুখী করবার জন্য শিক্ষকমহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্যের পূর্বকালের রচনার নমুনা ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

(১) ভরত কহেন ধরি রামের চরণ
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ॥
অযোধ্যা ভূষণ তুমি অযোধ্যার সার
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥ (রামায়ণ)

(২) একদিন দ্রোণাচার্য বিদ্যাপরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখেন বৃক্ষেতে ॥ (মহাভারত)

উপরের উদ্ধৃতিগুলির শব্দবিন্যাস এবং সুরমাধুর্য সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করে শিক্ষকমহাশয় কতগুলি সুনির্বাচিত বৈষ্ণব পদ ছাত্রদের আবৃত্তি করে শোনাবেন এবং বোর্ডে লিখে দিবেন। পদগুলি এ-ধরনের হতে পারে ঃ

(১) সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ (চণ্ডীদাস)

(২) মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥ (বিদ্যাপতি)

(৩) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ (জ্ঞানদাস)

(৪) কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর ॥ (গোবিন্দদাস)

উপরের উদ্ধৃতিগুলির অর্থ, শব্দবিন্যাস ও রচয়িতা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করে শিক্ষকমহাশয় পাঠঘোষণা করবেন।

পাঠঘোষণা ঃ আজ আমরা বাংলা সাহিত্যের অভিনব সম্পদ 'বৈষ্ণব গীতিকাব্য' সম্পর্কে আলোচনা করব।

উপস্থাপন ঃ শিক্ষকমহাশয় বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ছাত্রদের বলবেন, অথবা উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়বেন। আলোচনান্তে ছাত্রদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন ঃ

১। বাংলার প্রথম গীতিকবি কে ?

২। চৈতন্যপূর্ব যুগের দু'জন বৈষ্ণব পদকর্তার নাম কর।

৩। বৈষ্ণব সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ কোন্ সময় হয়েছিল ?
(চৈতন্যোত্তর যুগে)

৪। পদাবলী সাহিত্যের কি কি বিভাগ ?
(রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ও গৌরাঙ্গবিষয়ক)

৫। 'ব্রজ বুলি' বলতে কি বোঝ ?

উপরের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর ছাত্রদের থেকে নেবার সময় স্বাভাবিক-ভাবেই বিষয়সম্পর্কে আরও খানিকটা আলোচনা হবে এবং ছাত্রদের ধারণা স্পষ্টতর হবে।

অভিযোজন ঃ

১। বিদ্যাপতির নিবাস কোথায় ছিল ? তাঁকে বাংলার কবি বলে ভাবি কেন ?

২। বিদ্যাপতির প্রভাব কোন্ বাঙালী পদকর্তার উপর পড়েছিল ?

৩। যে চারজন পদকর্তার পদের খানিকটা পরিচয় তোমরা পেলে, তাঁদের মধ্যে কার পদ সবচেয়ে ভালো লাগছে, কেন ?

৪। যেসব পদের অংশবিশেষ তোমরা শুনলে, তা থেকে বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার নেই এরকম কয়েকটি শব্দ বেছে দাও।

বাড়ির কাজ : সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তক থেকে বা কোন বৈষ্ণব পদাবলী পুস্তক থেকে আলোচিত চারজন কবির একটি করে পুরো পদ নিজের নিজের পছন্দমত লিখে আনবে।

পাঠটীকা—১০

শ্রেণী—দশম

* * * বিষয়—বাংলা ব্যাকরণ।

* * * অদ্যকার পাঠ—বাগ্‌ধারা (বাক্‌চাল)

উদ্দেশ্য ঃ (১) বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর বাগ্‌বিধির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয়সাধনে সহায়তা করা।

(২) বাংলা ভাষাব ঐশ্বর্য, গতিশক্তি সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করা এবং স্বাধীন রচনায় বাগ্‌ধারার প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত করতে সহায়তা করা।

আয়োজন ঃ ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা এবং তাদের মন বিষয়াভিমুখী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকমহাশয় নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
(১) 'পঞ্চভূত' বলতে আমবা কি বুঝি ?	ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান।
(২) ক্ষিতি প্রভৃতি প্রত্যেকটি শব্দের কয়েকটি প্রতিশব্দ উল্লেখ কর।	ধরণী, মেদিনী, বসুধা ; বারি উদক, জীবন ; অনল, পাবক, বহ্নি ; অনিল, পবন, সমীর ; নভঃ, অম্বর, গগন।

(৩) মুখ তুলে চাও, মুখ করছ কেন ?
বড় মুখ করে এসেছি—বাক্যগুলির অর্থ বুঝিয়ে বলো।

পাঠঘোষণা ঃ আজ আমরা শব্দ ও বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উপস্থাপন ঃ শিক্ষকমহাশয় বোর্ডে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি লিখে দেবেন এবং মোটা অক্ষরগুলির অর্থ ছাত্রদের সহায়তায় স্থির করে পাশে বন্ধনী-মধ্যে লিখবেন।

(১) ছেলেটির অংকে **মাথা** আছে। (বুদ্ধি)

(২) যে-কোন কাজে সে আমার **ডানহাত**। (প্রধান সহায়)

(৩) যার **লাঠি** তারই **মাটি**। (শক্তি), (ভূ-সম্পত্তি)

(৪) তিনি **মোটা** টাকা রোজগার করেন। (প্রচুর)

(৫) **ধর,** তুমি লটারীতে লাখ টাকা পেলে। (মনে করো)

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বিশেষ্য বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি পদ ব্যবহারের কৌশলে স্বকীয় অর্থ হারিয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। ভাষার এই রীতিকে বাগ্‌ধারা বা বাক্‌চাল বলে।

[অতঃপর শিক্ষক মহাশয় কয়েকটি বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ সম্বলিত বাক্য বোর্ডে লিখবেন এবং ছাত্রদের সহায়তায় বাক্যাংশগুলির অর্থ স্থির করে পাশে বন্ধনী মধ্যে লিখবেন।]

(১) প্রতিবেশী দুজন একেবারে **আদায় কাঁচকলায়**। (ঘোর বিরোধী)

(২) তোমার মত **গোঁফ-খেজুরে** আর দুটি নেই। (অলস)

(৩) **উত্তম মধ্যম** দিয়ে লোকটাকে বিদায় কর। (প্রহার)

(৪) সিনেমার খবর ছাত্রদের যেন **নখদর্পণে**। (কণ্ঠস্থ)

(৫) **ডানহাতের ব্যাপারটা** আগে সেরে নেওয়া যাক্। (আহার)

সিদ্ধান্ত ঃ (খ) বাংলা ভাষায় প্রচুর বাক্যাংশ বাগ্‌ধারার অন্তর্গত।

[এবার শিক্ষকমশয় কতগুলি প্রবচন বোর্ডে লিখবেন এবং ছাত্রদের সহায়তায় অর্থ স্থির করে প্রবচনগুলির পাশে লিখে দেবেন।]

(১) অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি—(নিজেকে খুব চতুর মনে করলে ঠকতে হয়)

(২) কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—(যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা)

(৩) শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—(অসৎ ব্যক্তিই অসতের সমর্থক)

(৪) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল—(ভোগ্যবস্তু পাওয়ার পূর্বেই ভোগের কল্পনা)

সিদ্ধান্ত ঃ (গ) বাংলা ভাষায় বহু প্রবচন আছে। এগুলিও বাংলা বাগ্‌ধারার অন্তর্ভুক্ত।

[পরিশেষে শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করার জন্য সমঅর্থ-সূচক কয়েকটি বাক্যাংশ এবং প্রবচনের তালিকা ছাত্রদের সম্মুখে টাঙিয়ে দেবেন।]।

আদায় কাঁচকলায় = সাপে নেউলে।

চিনির বলদ = কলুর বলদ।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ = গোবরে পদ্মফুল।

গোবর গণেশ = আমড়া কাঠের ঢেঁকি।

অমাবস্যার চাঁদ = ডুমুরের ফুল।

তিল কুড়িয়ে তাল = রাই কুড়িয়ে বেল।

রথ দেখা কলা বেচা = এক ঢিলে দুই পাখী মারা।

পটল তোলা = অক্কা পাওয়া = শিঙে ফোঁকা।

লাল বাতি জ্বালা = গণেশ উল্টানো।

অভিযোজনঃ নীচের বাগ্‌ধারাগুলিতে লেখার ভুল থাকলে সংশোধন কর এবং সংশোধিত বাগ্‌ধারাগুলি বাক্যে প্রযোগ কব।

আপনি বাঁচলে মায়েব নাম, রুখু মাথায় তেল দেওয়া, সোনায় মুক্তা, দুধ ভাত দিয়ে কুকুব পোযা, চোব আসলে বুদ্ধি বাড়ে, অমৃতির প্যাঁচ, চাষীর বলদ, আহ্লাদে আধখানা।

বাড়ির কাজঃ বাড়িতে ব্যাকরণের বাগ্‌ধারা অধ্যায়টি পড়ে আসবে এবং অনুশীলনী থেকে যে-কোন দশটি বাগ্‌ধারা দিয়ে বাক্য গঠন করে আনবে।

পাঠটীকা—১১

বিষয়—বাংলা ব্যাকরণ

শ্রেণী—দশম

অদ্যকার পাঠ—অর্থালংকার

* * *

(উপমা, রূপক,

* * *

উৎপ্রেক্ষা)

উদ্দেশ্য ঃ (ক) বাংলা ব্যাকরণের তিনটি অর্থালঙ্কার ও তাদের প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

(খ) মাতৃভাষার ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও অনুরাগ বৃদ্ধি করা।

প্রস্তুতি ঃ ছাত্রদের মনকে প্রসংগাভিমুখী করার জন্য এবং তাদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য শিক্ষকমহাশয় নিচে লেখা প্রশ্নগুলির অবতারণা করবেন।

প্রশ্ন

১। বাজে রিনিঝিনি রুনু-ঝুনু সোনার নূপুর। (ক) কবি এখানে কোন্ অলংকার সৃষ্টি করেছেন ?

(খ) কোন্ কোন্ ধ্বনির অনুপ্রাস হয়েছে ?

২। তরিবারে ভব-সিন্ধু ভব সে ভরসা। (ক) এই ছত্রে কোন্ অলংকার হয়েছে ?

(খ) ভব-সিন্ধু পদটিতে কার সঙ্গে কার তুলনা ?

৩। উদাহরণ দিয়ে যমক অলংকারের স্বরূপটি বুঝিয়ে দাও।

পাঠঘোষণা ঃ কবি বা সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনায় অলংকার প্রয়োগ না করে পারেন না। ইতিপূর্বে আমরা শব্দের ধ্বনি-সৌন্দর্যের সহায়ক বিভিন্ন অলংকার (শব্দালংকার) সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আজ শব্দের অর্থ-সৌন্দর্যের সহায়ক কয়েকটি অলংকারের আলোচনা করব। এই শ্রেণীর অলংকারকে অর্থালংকার বলে।

উপস্থাপন ঃ শিক্ষকমহাশয় আজকের পাঠটিকে উপমা, রূপক এবং উৎপ্রেক্ষা—এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে ঐ-সব অলংকারসমন্বিত কয়েকটি উদ্ধৃতি বোর্ডে লিখে দেবেন এবং উপমেয়, উপমান ও তাদের মধ্যে তুল্যধর্মিতার বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ সম্পর্কে ছাত্রদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। প্রতি পর্যায়ের শেষে অলংকারের সংজ্ঞাটি বোর্ডে লিখে দেবেন।

প্রথম পর্যায়—

উদ্ধৃতি।	প্রশ্ন।
১। ননীর মত শয্যা কোমল পাতা	১। উপমেয় কী? উপমান কি? উভয়ের মধ্যে সাধারণ ধর্ম কী?
২। বরিষার ধারামত অজস্র জননী প্রেম।	২। 'জননী প্রেম'-কে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? কেন?
৩। অংগ-পরিমল সুগন্ধি চন্দনকুসুম পারা	৩। এই উদ্ধৃতিতে অঙ্গ-পরিমলকে কোন্ কোন্ বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? পারা শব্দটির অর্থ কি?
৪। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে	৪। এই বাক্যটি গদ্য না কবিতার অন্তর্গত?

সংজ্ঞা—সমান ধর্মযুক্ত দুইটি ভিন্নজাতীয় বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হলে উপমা অলংকার হয়। উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং উপমা-বাচক পদ—চারটিই উল্লিখিত থাকলে পূর্ণোপমা এবং এক বা একাধিকের উল্লেখ না থাকলে লুপ্তোপমা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়—

উদ্ধৃতি।	প্রশ্ন।
১। অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণশ্যেনের পক্ষে।	১। (ক) এখানে উপমেয় ও উপমান কি কি? (খ) বিহগীকে কে কিসের দ্বারা আঘাত করেছে?
২। কবিতা নিকুঞ্জে তুমি পিককুলপতি!	২। পিককুলপতি অর্থাৎ কোকিল থাকে কোথায়? কবিকে যদি কোকিল মনে করা যায়, তিনি থাকবেন কোথায়? তাহলে, কবিতাকে কি মনে করা হচ্ছে?
৩। বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওয়ব।	৩। বিরহকে কিসের মত সীমাহীন মনে করা হচ্ছে?

সংজ্ঞা—বস্তুগতভাবে উপমেয় ও উপমান বিভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হ'লে রূপক অলংকার হয়।

তৃতীয় পর্যায়—

উদ্ধৃতি।	প্রশ্ন।
১। ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।	১। ধরণীর উপহারকে কার উপহার বলে সংশয় হচ্ছে?
২। কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষাপাখী।	২। গায়ক-কণ্ঠের সুরগুলিকে পোষাপাখী বলে ভ্রম হচ্ছে কেন?
৩। মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।	৩। মুখ-কে কি বলে সংশয় হচ্ছে?

সংজ্ঞা: প্রবল সাদৃশ্য হেতু উপমেয়কে যদি উপমান বলে সংশয় হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। 'যেন', 'বুঝি', 'মনে হয়', প্রভৃতি সংশয় বাচক শব্দ থাকলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং ঐ-ধরনের শব্দ উহ্য থাকলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। তৃতীয় উদাহরণে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়েছে।

অভিযোজন: ছাত্রদের নবলব্ধজ্ঞান পরীক্ষা এবং অভ্যাসের জন্য শিক্ষকমহাশয় নিচের কবিতাংশগুলির অলংকার নির্ণয় করতে বলবেন।

১। বুদ্ধের করুণ আঁখিদুটি, সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

২। মরণের শীত নিবারণ করে বরফের কাঁথা ঢাকি।

৩। বক্ষবীণায় বেদনার তার, এইমত পুনঃ বাঁধিব আবার।

৪। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি!

৫। কান্না শেষে শিশুর মুখে হাসি
বর্ষাশেষে উজল সূর্যোদয়।

বাড়ির কাজ:—'আত্মবিলাপ' এবং 'কালবৈশাখী' কবিতায় উপমা ও রূপক অলংকার যতগুলি পাও লিখে আনবে।

কর্মভিত্তিক পাঠ ঃ প্রস্তুতি

শ্রীনাথ বহুরূপী ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(নাট্যরূপ)

প্রথম দৃশ্য

সময় – সন্ধ্যা। একটি ঢালা বিছানা, মাঝখানে সেজ জ্বলছে। সেজটি ঘিরে শ্রীকান্ত, যতীনদা, ছোড়দা ও মেজদা পড়তে বসেছে। প্রথম তিনজন একপাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে, অপর পাশে বসেছে মেজদা। বই খুলে যতীনদা ও ছোড়দা চুপ করে বসে আছে, শ্রীকান্ত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মেজদা খুব মনোযোগের সঙ্গে বিড্ বিড্ করে পড়ছে। মেজদা ওদের দিকে তাকালেই ওরা তিনজন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বার ভঙ্গীতে ঠোঁট নাড়ছে। একটু দূরে একটি খাটে শুয়ে পিসেমশায় তন্দ্রা উপভোগ করছেন। খাটের অন্যদিকে মাটিতে বসে ভট্চায মশায় চোখ বুঁজে হুঁকো টানছেন। তাঁর গায়ে সাদা চাদর, গলায় সাদা মোটা পৈতার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মিনিট দুই কেটে গেল।

নেপথ্য থেকে 'হুঁম্' শব্দ শোনা গেল।

ছোড়দা, যতীনদা। (কাতরভাবে চীৎকার কোরে) ওরে বাবারে খেয়ে ফেললে রে। ওরে বাবারে—

মেজদা—(পা ছুঁড়ে, সেজ উল্টে দিয়ে) ওঁ—ওঁ—ওঁ— [মেজদা চিৎ হয়ে পা দুটো ছড়িয়ে ফিট্ হয়ে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চে স্তিমিত আলো। পিসেমশায় ছোড়দা ও যতীনদাকে বগলে চেপে ভীত অবস্থায় প্রবেশ করলেন।]

পিসেমশায়। (চীৎকার করে) ব্যাপার কি ? বলি ব্যাপারটা কি ? কেয়া ! চৌর ! মারো, আউর মারো, মার ডালো।

মঞ্চের দুদিক থেকে উজ্জ্বল লণ্ঠন হাতে ব্যস্তভাবে তিনজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্যেরা। (সমস্বরে) চোর ! চোর !! চোর !!!

দুজন দারোয়ান ভট্‌চায্যিমশাইকে টানতে টান্‌তে মঞ্চে প্রবেশ করল এবং ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

পিসেমশায়, ভৃত্যেরা, ছোড়দা, যতীনদা (সবাই প্রায় একসঙ্গে)। আরে, এযে আমাদের ভট্‌চায্যি মশায়!

[ভৃত্যেরা লণ্ঠন ফেলে ছুটে পাখা ও বাল্‌তিতে জল নিয়ে এল এবং ভট্‌চায্যিমশাই-এর চোখে জলের ছাট দিতে লাগল এবং তাঁকে সজোরে বাতাস করতে লাগল।]

ভট্‌চায্যিমশাই। (ফুঁপিয়ে কেঁদে) বাবা বাঘ নয়, সে একটা ভালুক,—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এল।

ছোড়দা, যতীনদা। ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ।

নেপথ্য থেকে মেজদা। দি-রয়েল-বেঙ্গল-টাইগার!

তৃতীয় দৃশ্য

[মঞ্চে স্তিমিত আলো। ব্যাঘ্রবেশী শ্রীনাথ বহুরূপী মঞ্চের এককোণে একটি গাছের আড়ালে বসে। লাঠি হাতে কিশোরী সিং-এর প্রবেশ।]

কিশোরী (হঠাৎ বাঘরূপী শ্রীনাথকে দেখে)—উহ্‌ বয়ঠা!

[ছুটে কিশোরীর প্রস্থান]

ইন্দ্রনাথের প্রবেশ

নেপথ্য থেকে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর। 'ওরে বাঘ, বাঘ! পালিয়ে আয়রে, পালিয়ে আয়।'

ইন্দ্র লণ্ঠন নিয়ে বাঘ দেখতে লাগলো।

নেপথ্য থেকে কয়েকটি স্ত্রীকণ্ঠ। দুর্গা দুর্গা; দুর্গা দুর্গা; মাগো রক্ষে কর!

নেপথ্য থেকে সিপাইদের কণ্ঠ। কুচ্‌ পরোয়া নহি, ডরো মত্‌। আগে বঢ়ো; এক এক হাতিয়ার রহনেসে হমলোগভি সাথ দেতে।

ইন্দ্র। (নির্বিকার ভাবে লণ্ঠন দিয়ে বহুরূপীকে ভালো করে দেখে) এ বাঘ নয় বোধহয়।

শ্রীনাথ। (দু'হাত জোড় করে, কেঁদে) না বাবুমশায়, না; আমি বাঘ-ভাল্লুক নই, আমি ছিনাথ বউরূপী।

[ইন্দ্রনাথের অট্টহাস্য। বাঁ পায়ে খড়ম, ডান পায়ের খড়ম ডান হাতে

—এইভাবে উত্তেজিত হয়ে ভট্‌চাযিমশাই-এর দ্রুত প্রবেশ, পিছনে পিসেমশাই ও কিশোরী সিং]

ভট্‌চাযিমশাই। (শ্রীনাথের দিকে তেড়ে এগিয়ে) ভয় দেখাবার জায়গা পাস্‌না?

পিসেমশাই। (কিশোরী সিংকে) উস্‌কো কান পাকাড়কে লাও।

কিশোরী সিং শ্রীনাথের কান ধরে হিড়হিড করে ওকে মঞ্চের মাঝখানে টেনে আনলো।

ভট্‌চাযিমশাই। (খড়ম দিয়ে শ্রীনাথের পিঠে আঘাত করে) এই হতভাগাকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া।

শ্রীনাথ। (একবার পিশেমশাই ও একবার ভট্‌চাযিমশাই-এর পায়ে পড়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে) এবার ছেড়ে দিন বাবুমশাই; ছেলেরা ভয় পেয়ে এমন কাণ্ড বাধাবে বুঝতে পারিনি, হুজুর। আমিও ভয় পেয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম।

নেপথ্যে পিসিমা। তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বের হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা আর তোমার দারোয়ানরা! ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ীর ঐ দারোয়ানগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই!

পিসেমশাই। (রেগে) কিশোরী, দাও, দাও, ওর লেজ কেটে দাও।

[কিশোরী সিং ট্যাঁক্ থেকে ছুরি বের করে শ্রীনাথের খড়ের লেজ কেটে]

যা, তু ভাগ্।

পিসিমা। রেখে দাও ওটা অনেক কাজে লাগবে!

কর্মভিত্তিক পাঠ ঃ পাঠ-পরিলেখ—১২

বিষয়—বাংলা সাহিত্য। গল্প।

শ্রেণী—ষষ্ঠ

অদ্যকার পাঠ—অভিনয়ের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীনাথ বহুরূপী' নামক গল্প।

উদ্দেশ্য ঃ

(ক) সহপাঠক্রমিক

(১) অভিনয়ের মাধ্যমে ছাত্রদের আত্মপ্রকাশে সহায়তা করা।

(২) অভিনয়ের মাধ্যমে যৌথ কর্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত হতে সহায়তা করা।

(খ) পাঠক্রমিক

(১) গল্পটির রস ও বিষয়বস্তু বুঝতে সহায়তা করা,

(২) গল্পটির বিভিন্ন চবিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং অপরাপর চরিত্র থেকে থেকে ইন্দ্রনাথ-চরিত্রেব পার্থক্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করা।

(৩) গল্পকারেব ভাষা প্রযোগেব অপূর্ব কৌশল লক্ষ্য করতে সহায়তা করা।

পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ঃ

'বহুরূপী' অভিনয় হবে স্থিব হ'ল। সম্ভব হলে প্রথম দিনেই ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের সহায়তায় কে কোন্ ভূমিকা নেবে, কাকে কোন্ ভূমিকা মানাবে ইত্যাদি স্থির করে খানিকটা মহড়া দিবে। ছাত্রছাত্রীরা নিজের নিজের পার্টটুকু লিখে নেবে, বাড়িতে প্রস্তুতির জন্য। মহড়া একদিন বা দু'দিন চল্‌তে পারে। সাধারণতঃ এটা চল্‌বে শ্রেণীকক্ষে বাংলা সাহিত্য পাঠের নির্দিষ্ট পিরিয়ডে।

[শিক্ষকমহাশয় গল্পটির নাটকীকরণের উপযুক্ততা আছে লক্ষ্য করে নিজস্ব প্রস্তুতি হিসেবে বাড়িতেই এ-সম্পর্কে চিন্তা করে নাট্যরূপের একটা খসড়া করে রাখবেন। ফলে দৃশ্য বিভাগ ও অন্যান্য খুটিনাটি নির্দেশ তিনি সার্থকভাবে দিতে পারবেন।

যথারীতি প্রস্তুতির পর একদিন অভিনয় হবে। সেদিন ব্যবস্থা করে দু'তিনটি পিরিয়ড্ শিক্ষক একসঙ্গে নিতে পারেন। শনিবার ছুটির পরও অভিনয় হতে পারে। অভিনয় হবে শ্রেণীকক্ষে বা বিদ্যালয়ের কোন উপযুক্ত

জায়গায়। ছাত্রছাত্রীরা নিজের নিজের ভূমিকার উপযুক্ত বেশভূষা সঙ্গে নিয়ে আসবে। দু'তিনজন ছাত্রছাত্রী সূত্রধরের কাজ করবে। স্থানাভাব না হলে স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক দর্শক হবে, নয়তো শ্রেণীর শিক্ষক ও শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই হবে দর্শক।

মূল্যায়ন—পাঠক্রমিক উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হল কিনা জানবার জন্য শিক্ষক-মহাশয় অভিনয়ের পরের দিন শ্রেণীকক্ষে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

১। (ক) ওরে বাবারে, খেয়ে ফেল্‌লেরে—কারা এ'কথা বলেছিল? কখন?

(খ) 'আউর মারো, মার ডালো'—এ হুকুম কার? তিনি এ হুকুম দিয়ে কি ভুল করেছিলেন?

(গ) 'একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই' —এ উক্তি কে করেছিলেন, কেন?

(ঘ) 'রেখে দাও, এটা অনেক কাজে লাগবে'—বক্তা কি রেখে দিতে বলছেন?

২। নীচে বাঁদিকে কতগুলি উক্তি দেওয়া হল এবং প্রত্যেক উক্তির ডানদিকে কতগুলি সম্ভাব্য বক্তার নাম দেওয়া হ'ল। সঠিক বক্তাটির নামের নীচে দাগ দাও।

(ক) 'এ বাঘ নয় বোধ হয়'— (পিসেমশয়, ইন্দ্রনাথ, ভট্‌চায্যি মশাই)

(খ) 'বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক'—(পিসেমশয়, ইন্দ্রনাথ, যতীনদা)

(গ) 'রেখে দাও ওটা, অনেক কাজে লাগ্‌বে'—(পিসিমা, পিসেমশয়, ভট্‌চায্যিমশাই)

(ঘ) 'সড়্‌কি লাও, বন্দুক লাও'—(কিশোরী সিং, পিসেমশয়, কোনো সিপাই)

(ঙ) 'হতভাগা, তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাওনা?— (পিসেমশয়, ভট্‌চায্যি মশাই, মেজদা)
